মুক্ত মহাচীন

ভূপর্য্যটক

শ্রীরামনাথ বিশ্বাস

মরণ-বিজয়ী চীন, দুরন্ত দক্ষিণ-আফ্রিকা, মালয়েশিয়া ভ্রমণ,
সর্ব্ব-স্বাধীন শ্যাম প্রভৃতি রচয়িতা

ভট্টাচার্য্য সন্স্ লিমিটেড্
১৮বি, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

সূচীপত্র

নিউ ডেমোক্রেসি

দ্বিতীয় মহাসমর পৃথিবীকে অনেক কিছু নতুন উপহার প্রদান করেছে। 'নিউ ডেমোক্রেসি'ও তারই অভিনব অবদান। সতত-পরিবর্ত্তনশীল জগতে বর্ত্তমান বলে কিছু নাই। আছে অতীত আর ভবিষ্যৎ। বর্ত্তমান তো প্রতি মুহূর্ত্তেই অতীতে পরিণত। আজ ১৯৪৯-এ চীনের সাম্প্রতিক ঘটনা তার প্রমাণ।

শুধু চীনে বলি কেন, দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া, ইউরোপের বল্‌কান্‌ রাজ্যগুলা, গ্রীস, পোল্যাণ্ড—সর্ব্বত্রই রাজনীতি-সংবৃত অর্থনৈতিক অন্তর্বীজ নতুন উন্মেষে অন্যকার 'নিউ ডেমোক্রেসি'কে আকার দিতে বদ্ধপরিকর। কাজেই চীনের সমাজতন্ত্র-বিপ্লব অধুনা কর্ম্মপন্থার যে পরিবর্ত্তন সূচনা করেছে, তা শুধু চীনের স্বতন্ত্র ব্যাপার মাত্র নয়, সমগ্র বিশ্বে যে কমিউনিষ্ট সহব্যাপ্তি বা অভিযোজন, তারই অংশ।

নিউ ডেমোক্রেসি মার্কস-লেনিনবাদের বিচ্যুতি নয়, তারই অনবচ্ছেদ, কারণ মূল সত্য অবিকৃত, অধিবক্তাগণ দৃঢ়তার সঙ্গে প্রচার করেছেন। তবে রূপান্তরশীল জগতের নব অভিব্যক্তিই সমাজতন্ত্র-বিপ্লবের ব্যাবর্ত্তিত নবধারার জননী— মার্কস-এর বিশ্লেষণে হয়তো যে অগ্রজ্ঞান অদৃষ্টই ছিল, একথা অনুমান করা যেতে পারে।

আর একথাও সত্য যে, শতধা-মতবাদ-কণ্টকিত দুনিয়ায় নিউ ডেমোক্রেসির অত্যাধুনিক রূপটি, বিশেষ করে ধনতন্ত্র হতে সমাজতন্ত্রে পরিণতির পথে মার্কস্‌-প্রতিপাদিত রাষ্ট্রের ক্রম বিবর্ত্তনের মত, এমন অপ্রতিহত প্রভাব মহাচীনে বিস্তারে সমর্থ হতো না, যদি না সকল শ্রেণীর পূর্ণ গণ-সমর্থন (প্রোলেটারিয়েট) এর পশ্চাতে থাকতো। ডেমোক্রেসির নবরূপ এটি, ইহা নিঃসন্দেহ।

এশিয়া মহাদেশে নিউ ডেমোক্রেসি'র আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোচ্চ পারদর্শী উদ্‌গাতা, চীনা কমিউনিষ্ট পার্টির নেতা, মাও সে তুন্‌। আজ চীনে সামন্ত-তন্ত্র ও ঔপনিবেশিক-তন্ত্রের সমবায়েরই নামান্তর—চীনের বর্ত্তমান লক্ষ্য সমাজতন্ত্র বিপ্লব নয় এবং শীঘ্র সে বিপ্লব আরোপ হবারও লক্ষণ দেখা যায় না, কারণ আপাততঃ চীনের উদ্দেশ্য সব কিছু 'বৈদেশিক' হতে মুক্তি লাভ করে জাতীয় স্বাধীনতা পরিপূর্ণভাবে অর্জ্জন।

[দুই]

সে উদ্দেশ্য বাস্তবে কি, সংক্ষেপে বল্‌তে গেলে, নিম্নোক্ত ছয়টি দফারই মোটামুটি আকার ধারণ করে :—

১। রাজতন্ত্র ও সামন্তিক তন্ত্র সমূলে উৎপাটিত করে, শিল্প-বাণিজ্যিক অর্থনীতিকে নব ধনতন্ত্র ও নিউ ডেমোক্রেসি সাহায্যে সংস্কার, সংগঠন ও দৃঢ়ীকরণ।

২। চীনের গণতন্ত্র ও তৎ-সংশ্লিষ্ট পুঁজিবাদ তাই প্রতীচ্যের অনুকরণ হবে না, হবে নিউ ডেমোক্রেসি, নিউ ক্যাপিটালিজ্‌ম্।

৩। ধনিক-নেতৃত্ব বা প্রোলেটারিয়েট সর্ব্বাধিনায়কত্ব এ বিপ্লবকে নিয়ন্ত্রণ-পরিচালন করবে না, পরিচালিত হবে শ্রমিক শ্রেণীদ্বারা, অন্যান্য সকল শ্রেণীর প্রগতি-সম্পন্ন কর্ম্মিগণের প্রত্যক্ষ যোগদান সাহায্যে, বিশেষ করে উদারনীতিক ধনপতি ও মুক্ত-দৃষ্টি ত্যাগব্রতী জমিদারগণের সহযোগিতা সহকারে। তদুপরি বিপ্লবকে বাস্তব রূপ দিতে যথাসম্ভব স্বল্পতম ব্যয় ও ক্ষতি সাধনই লক্ষ্য হবে, সে জন্য সকল শ্রেণীর প্রাণ-স্পর্শের উদ্দেশ্যে ত্রুটিহীন প্রচার অবশ্য কর্ত্তব্যে পর্য্যবসিত হবে।

৪। অর্থনীতির বিধান হবে মূলতঃ—জমির মালিক চাষী। নিউ ক্যাপিটালিজ্‌ম্ সকল প্রকার উৎপাদন-করী প্রতিষ্ঠানকেই (বে-সরকারী, কো-অপারেটিভ ও জাতীয়) স্থান-দান করবে যাতে সর্ব্বাবস্থায়ই শ্রমিক ও ধনিকের সহযোগ প্রতিষ্ঠিত হয়।

৫। ব্যক্তিগত একচেটিয়া মূলধন নিষিদ্ধ হবে।

৬। কমিউনিষ্টগণ সরকারী চাকরির এক-তৃতীয়াংশের বেশি অধিকার কর্‌তে পারবে না। বাকি পদগুলি অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের প্রগতিসম্পন্ন কর্ম্মী দ্বারা পূর্ণ হবে।

কাজেই নিউ ডেমোক্রেসি ধনতন্ত্র অপেক্ষা রাজতন্ত্র ও সামন্ত-তন্ত্রকেই নিঃশেষে উৎখাত করবে, চীনের রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণে তাই হবে সামন্ত-তন্ত্র-বিরোধী রাজতন্ত্র-বিরোধী বিভিন্ন জনপ্রিয় শক্তির সমন্বয় অর্থাৎ কোয়ালিশন্। মার্কস্‌বাদের বাধ্যতামূলক শ্রেণী-সংঘাত (class-war) এর ওপর সম্প্রতি জোর দেওয়া হচ্ছে না, সকল দলের সম্মতিই কাম্য বলে মনে হয়।

মুক্ত মহাচীন

যুদ্ধ-বিগ্রহ—বিপ্লব

সামন্ত-তন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী

সেকালের মহাচীনে যুদ্ধ-বিগ্রহ ছিল নিত্যকার ব্যাপার। যেমন অন্তর্দ্বন্দ্ব তেমনি বিদেশীর অভিযান। যুদ্ধের আবশ্যিক পরিণাম—অশান্তি ও অরাজকতার সীমা ছিল না দেশের বুকে—চীন হয়ে পড়েছিল বিনাশ আর ধ্বংসের লীলাভূমি।

আবার যুদ্ধ-বিরতি কালেও চীনের প্রজা সাধারণের স্বস্তি ছিল না বিন্দুমাত্রও। সম্রাট নিজেকে থংসান অর্থাৎ স্বর্গরাজ্য চীনের অধিপতি বলে মাটির ধরার নর-নারীকে ঘৃণার চক্ষেই দেখতেন; এমন কি সারা বিশ্বের যে রাজা-রাজড়া, তাদের অপেক্ষাও তিনি নিজেকে শ্রেষ্ঠতরই মনে করতেন। সেজন্য শ্বেতজাতি যখন যে প্রার্থনা নিয়ে তাঁর দরবার করতো, তিনি তৎক্ষণাৎ সে প্রার্থনা মঞ্জুর করতেন শ্রদ্ধায় নয়, উপেক্ষার সঙ্গে। কারণ সে সকল ভিক্ষাপ্রার্থী বিদেশী রাজাদের তিনি কৃপার চোখে দেখে আপন অহমিকা চরিতার্থ করবার জন্যই সুযোগ-সুবিধা করে দিতেন চীনরাজ্যে।

তাতে যে চীনবাসীর প্রভূত অকল্যাণ হচ্ছে সে দিকে দৃষ্টি দেওয়া, কি জনগণের সুখ-দুঃখের খবর রাখার মত 'অসম্মানকর' মতিগতি ও 'হীন'-কার্য্য সে স্বর্গাধীশ তাঁর কর্ত্তব্যের গণ্ডির ভিতর হতে করেছিলেন বহিষ্কার।

কাজেই রাজ্যশাসন কার্য্যে তিনি থাকতেন চক্ষু মুদিত করে। জনকয়েক জমিদার ও ধনপতিই সকল ক্ষমতা আয়ত্ত করে খেয়াল-খুশিমত চালাতো চীন রাজ্যকে। তারা জনসাধারণের প্রতি, দেশের স্বার্থের প্রতি ছিল উদাসীন। কারণে অকারণে তারা প্রজাদের করতো শাসন ও শোষণ। তবে জটিল ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে গ্রহণ করতো রাজার সম্মতি। তা শুধু মৌখিক নিয়ম-তান্ত্রিকতা মাত্র।

দেশের বিত্তশালী ও উচ্চ রাজপুরুষদের শোষণ-শাসনই চীনবাসীর একমাত্র দুর্দ্দশা ছিল না। নিদারুণ নির্য্যাতন ও বিষম লাঞ্ছনা তাদের ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার সাম্রাজ্যবাদী জাতিগুলার হাতে, জাপানীদের রাজ্য-লালসার যূপকাষ্ঠে। এ ব্যাপারে আবার ব্রিটেন ছিল সকলের অগ্রবর্ত্তী।

ব্রিটেন্ অবশ্য প্রথম বিদেশী শক্তি নয়, যে চীনের বুকে অবাধ ব্যবসার নামে চালিয়েছিল স্বেচ্ছাচার। তার আগে এসেছিল ওলন্দাজ, পর্ত্তুগীজ। কিন্তু ব্রিটিশের চতুর নিয়ন্ত্রণে ওই জাতিদের ক্ষমতা, চীন-সম্রাটের ওপর প্রভাব হয় ম্লান।

ব্রিটিশের চীন জুড়ে বসবার পর-পরই এল ফরাসী, এল জার্ম্মান, এল আমেরিকা। প্রতিবেশী জাপান আর কেনই বা বঞ্চিত থাকবে, সেও এসে জুটলো। জারের আমলের রুশরাও প্রলুব্ধ হয়ে এসে বসলো উত্তরে। চল্‌লো বিদেশী কনস্যেশনের পর কনস্যেশনের সৃষ্টি, সারা চীনে বিদেশীর ন্যায্য অন্যায্য সকল প্রকার অবাধ বাণিজ্যের ছলা-কলা।

তাইপিং বিদ্রোহ

বছরের পর বছর যুদ্ধের তাণ্ডব, হৃদয়হীন নিপীড়ন-শোষণ গণমনে ক্ষোভ ও বিদ্বেষ-বহ্নি করছিল সঞ্চিত। কিন্তু নিরুপায় জনগণ মনের আগুন মনেই চেপে থাকে, পথ আর দেখ্‌তে পায় না উদ্ধারের।

এমনই দিনে দেখা দিল নরমপন্থী সংস্কারবাদী দেশ-হিতৈষী-দল। তারা জাতিতে খৃষ্টান, বিদেশী মিশনারীদের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত। তবে তাদের দৃষ্টি ছিল কতকটা প্রগতির বাহক। তাদের পশ্চাতে ছিল বহু চিন্তাশীল শ্বেতকায়ের উদার সমর্থন।

এ দলের শিক্ষা এমন ছিল না যে সরাসরি বিদেশী-বিদ্বেষ প্রচার করতে পারে। শ্বেত শিক্ষাদাতাদের ইঙ্গিতে তারা বিপ্লবের সৃষ্টি করলো সামন্ত-তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। তারা মনে করলো সামন্ত-তান্ত্রিকতার অবসান হলেই দেশে শান্তি ফিরে আসবে।

জনগণের ক্ষুব্ধ মনের আগুন আত্মপ্রকাশ করলো—তাইপিং বিদ্রোহের আকারে। নেতা চীনের খৃষ্টান প্রগতিশীল দল। বিক্ষোভ দেখা দিল সামন্ত-তান্ত্রিক রাজশক্তি রবিরুদ্ধে।

যে সকল দেশীয় ব্যবসাদার বিদেশী শ্বেতজাতির কারসাজিতে ব্যবসা হতে হয়েছে বঞ্চিত, যে সকল চীনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জীবিকা-পেশা হারিয়েছে তারা আর চির-শোষিত দুঃস্থ মজুরদল সাড়া দিল এ আহ্বানে। বিদ্রোহ ভয়ঙ্কর আকার ধারণ করলো।

শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীরা দেখ্‌লো চীনে প্রতিপত্তি বজায় রাখতে হলে তাদের স্বার্থের পরিপোষক সামন্ত-তন্ত্রের ঠাট অক্ষুণ্ণ রাখ্‌তে হবে। তারাই সকলে মিলিত হয়ে রাজ-সরকারের পক্ষ হয়ে বিদ্রোহীদের প্রতিরোধ করলো। দীর্ঘকাল জুড়ে তিন তিনবার চল্‌লো যুদ্ধ। প্রথম দুই যুদ্ধে সরকারী সৈন্য আদপেই যোগদান করে নাই। তৃতীয় বারের যুদ্ধে চীন-সরকারের সেনা-বাহিনী, ইংরেজ ফরাসী মার্কিন প্রভৃতি সেনার সহযোগে বিদ্রোহীদের উচ্ছেদ সাধন করলো।

ওপিয়াম ওয়ার

এরই ফাঁকে সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ ও ফরাসী আরম্ভ কর্‌লো যার নাম দেওয়া হয়েছে 'ওপিয়াম ওয়ার' অর্থাৎ আফিং-এর যুদ্ধ। সেনা সাহায্যে চীনবাসীর রক্তে নগর-গ্রাম রঞ্জিত হলো। কেন? না, চীনবাসী আফিং খেয়ে নেশায় বুঁদ হয়ে থাক্, আর দু হাতে অঞ্জলি ভরে তুলে দিক তাদের সোনা, তাদের যথাসর্ব্বস্ব সাম্রাজ্যবাদী শ্বেতকায়দের পকেটে!

চীনবাসীর উপায়ান্তর নাই, তাদের যে কোন ক্ষমতাই নাই তাদের নিজের দেশে। মানবের প্রাথমিক অধিকারও তাদের অজানিত। বিদেশীর বিরুদ্ধে দাঁড়াবার মত, আফিম্ প্রবর্ত্তনের প্রতিবাদ করবার মত মনের বলেরও তাদের অভাব। যাদের হাতে ক্ষমতা, যারা ইচ্ছা কর্‌লে বহির্জ্জগতে প্রচারদ্বারা, সশস্ত্র বাধা-প্রদান দ্বারা অন্যায় আফিম্ যুদ্ধের পার্‌তো প্রতিবিধান কর্‌তে কতকটা, সেই ক্ষমতাপ্রাপ্ত উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারী আর পুঁজিপতির দল বিদেশীর স্বার্থেরই পূজারী, সেদিকেই তাদের দৃষ্টি সজাগ, আর সে পথেই তারা নিজ নিজ স্বার্থ উদ্ধার করে ধনকুবেরে পরিণত।

চীনের রাজশক্তি তখন মাঞ্চু রাজবংশের কবলে, যাদের কোন দরদই নাই চীনাদের ওপর। রাজপুরুষরাও বিদেশীর হাতের পুতুল। কাজেই আফিম্ যুদ্ধে জনগণের হয়ে কে কর্‌বে অঙ্গুলি-হেলন?

রাজশক্তি নিতান্ত উপায়হীন হয়েই করলো সন্ধি। সাংহাই 'আন্তর্জাতিক বন্দর' বলে স্বীকৃত হলো। ট্রিটি (সন্ধি সর্ত্তাধীন) বন্দরগুলায় শ্বেতাঙ্গদলের ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হলো, এমন কি আমদানি পণ্যের ওপর শুল্ক ধার্য্য ও আদায়ের সর্ব্বনিয়ন্তাও হয়ে পড়লো শ্বেতকায় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলা। চীন-সম্রাট সে অধিকার হতেও বঞ্চিত হলো। শুধু তা-ই নয়, সরকারী শুল্ক বিভাগে যে সকল কর্ম্মচারী নিযুক্ত হতো, তাও শ্বেতদের অনুমোদনে। এমনি সর্ব্বগ্রাসী সে সন্ধির সর্ত্ত।

তাইপিং বিদ্রোহের পরিণাম

এমনি করে মাঞ্চু-সরকারের কাছ হতে অনেক কিছু সুবিধা আদায় করে শ্বেতকায়েরা যথেষ্ট শক্তি বৃদ্ধি করে নিল। এবারে তারা তাইপিং বিদ্রোহীদের ওপর নির্ম্মম অত্যাচার চালাতে অগ্রসর হলো।

গোড়া থেকেই বিদ্রোহীদের ঠেকিয়ে রাখা হয়েছিল শ্বেতঘাঁটি সাংহাইয়ের বাইরে। অবিরাম চল্‌লো নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড, অবশ্য যুদ্ধের নাম দিয়ে এবং বিদ্রোহীদের হৃদয়হীন দস্যু আখ্যা দিয়ে। পাইপিং, তিয়েনসিনের ওপর চলে অবিশ্রান্ত গোলা বর্ষণ। কামানের গোলায় অসংখ্য চীনা প্রাণ হারালো। বন্দরের পর বন্দর শ্বেতদের দখলে এল। মায় উত্তর-চীনের পকু দুর্গ অবধি।

ইঙ্গ-ফরাসী-মার্কিন মিলিত স্থল-সৈন্য ও নৌ-বাহিনী দিকে দিকে রক্তবন্যা প্রবাহিত করে নিজ নিজ অধিকার বর্দ্ধিত করে নিল। খাদ্যশস্য পুড়িয়ে দেওয়া হলো, চীনা নরনারীকে পশুবৎ হত্যা করা হলো। বিদ্রোহীরা নির্দ্দয়ভাবে নিষ্পিষ্ট তো হলোই, নির্দ্দোষ জনগণও রেহাই পেল না।

তাইপিং বিদ্রোহীদের সমর্থক শ্বেতপুঙ্গবেরা ইউরোপে ও আমেরিকায় আন্দোলন চালালো। নির্ম্মম হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করলো। সাম্রাজ্যবাদী শাসকগোষ্ঠী এটাকে অতিরঞ্জিত অপপ্রচার বলে ঘোষণা করলো। জানালো তাদের বাঁধাবুলি—দেশীয়গণের প্রাণ ও বিত্তরক্ষায় এবং শ্বেতাঙ্গদের নিরাপত্তার জন্য গুটিকতক দস্যুকে উচ্ছেদ সাধন করা হয়েছে।

চীনের সামন্ত-প্রভুদের টিকিয়ে রেখে শ্বেতকায়দের চললো রীতিমত প্রতিযোগিতা—কে কার আগে কোন্ বিশেষ সুবিধা আদায় করে নেবে। খেয়ালমত এক-এক শক্তি সৈন্য-সমাবেশ করে নৌ-বহর উদ্যত করে হুমকি দিত

আর আদায় করে নিত নতুন কন্‌সেশন, নতুন বাণিজ্যিক চুক্তি, নতুন ব্যবসা পরিচালন।

পাশ্চাত্য শক্তিগুলা চীনকে প্রায় কুক্ষিগত করে ফেলেছে, জাপান বেশি কিছু পায় নাই। সে যুদ্ধ ঘোষণা করলো চীনের বিরুদ্ধে (১৮৯৪)। যুদ্ধে জয়ী হয়ে জাপান লাভ কর্‌লো ফর্‌মোজা দ্বীপ ও লিওতান উপদ্বীপ। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের টাকা যা দাবী করা হলো তা দেবার শক্তি চীনের ছিল না। রুশিয়া এগিয়ে এসে মধ্যস্থতা করে দিল এবং ক্ষতিপূরণের টাকা পরিশোধ করবার জন্য চল্লিশ কোটি ফ্রাঙ্ক ধার দিল। কোরিয়াকে স্বাধীন করে দেওয়া হলো।

কিন্তু শ্বেত শক্তিবর্গ, জাপান এত বেশি লাভবান হবে এটা সহ্য কর্‌লে না। কাজেই জাপানকে লিওতান অর্থাৎ তাইওয়ান ও পোর্ট আর্থার ত্যাগ করতে হলো, রুশিয়া তা অধিকার করলো, তার ওপর রুশ পেয়েছিল চীনা ইষ্টার্ণ রেলওয়ে তৈরি ও পরিচালনার ভার (পোর্ট আর্থার পর্য্যন্ত)। ব্রিটিশ ও ফরাসী অন্য দিকে স্থান অধিকার করলো, নৌঘাঁটি স্থাপনের (চিলি উপসাগরের তীরস্থ উইহেইউই এবং কোয়াংচৌ উপসাগরের কোয়ান-চান-ওয়ান)। সানম্যান উপসাগরে ইটালী নৌঘাঁটি দাবী করলো। জার্ম্মানী নিংতাও দখল করলো, সানতুং প্রদেশে নিজ রেলপথ নির্ম্মাণ করলো। জাপান ফুকিয়েন প্রদেশকে তাদের 'আয়ত্ত এলাকা' বলে ঘোষণা করলো। ফরাসীরা ইন্দোচীন ছিনিয়ে নিল।

সান ইয়াৎ সেন ও কুওমিন্তাং

নরমপন্থী রাজনীতিকদের পশ্চাতে নতুন রাজনৈতিক দৃষ্টি নিয়ে এক দল বিপ্লবীর আবির্ভাব হয়েছিল, যে দলের নেতা হলেন সান ইয়াৎ সেন। আফিং ত্যাগ, বেণীকর্ত্তন, নারীর লৌহজুতা বর্জ্জন, গণশিক্ষা, কৃষিসংস্কার প্রভৃতি তাদের লক্ষ্য হলেও, প্রকৃত উদ্দেশ্য তাদের সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, যাতে করে সামন্ত-তন্ত্র ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের ক্রম-বিলয় সম্ভবপর হবে বলে তাদের বিশ্বাস ছিল।

১৮৯৪ খৃঃ অঃ জাপানের যুদ্ধ ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে কুওমিন্তাং দল গঠিত হলো। ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর চীনবাসী এ দলে যোগদান করে, অর্থ সাহায্য করে, হুবহু ভারতের কংগ্রেসের মত। কেবল যোগ দেয় নাই সরকারী কর্ম্মচারীর দল। তারা সান ইয়াৎ সেনের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায়।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ছিলেন গণতন্ত্রে বিশ্বাসী। তারপর কৃষক-মজুরদের ওপর তাঁর ছিল অপরিসীম দরদ। তাই গণশিক্ষার জন্য তিনি বহু প্রয়াস করেছিলেন, কৃষি-সংস্কারের সূত্রপাত করেছিলেন। এ সকল প্রচারই তাঁকে রাজশক্তির চক্ষুশূল করে তোলে। কোয়ানটাং প্রদেশের শাসনকর্ত্তা তাঁর বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে। তিনি পলাতক হন। হংকং প্রভৃতি কয়েকটি স্থানে নিরাপদ আশ্রয় লাভে অকৃতকার্য্য হয়ে দেশত্যাগে বাধ্য হন। জাপানে গিয়েও স্বস্তি পান না। যান আমেরিকায়, সেখানেও তাঁকে তিষ্ঠিতে দেওয়া হয় না। কাজেই তিনি ইউরোপের দেশে দেশে ঘুরে বেড়ান, স্থায়ী বিশ্রামস্থান হয় লণ্ডনে।

সাম্রাজ্যবাদীরা চীনে যে কল-কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিল, চীনের ধনিকগণ তারই অনুকরণ করতে লাগলো। কারণ তারা দেখলো দেশের প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদ ও সস্তা মজুরীর সুযোগ গ্রহণ করলে যথেষ্ট মুনাফা পাওয়া যায়। টাকা খাটাবার এমন সহজ উপায় তাদের বড়ই লোভনীয় হলো। কিন্তু তাতে বাদী হলো বিদেশী মূলধন যা নাকি চীনে এতদিনে দৃঢ়মূল। চীনের এই যে আধা সামন্ত-তান্ত্রিক আধা পুঁজিবাদী অবস্থা, আজও তার মূলতঃ ব্যতিক্রম হয় নাই।

তা হলেও নতুন ধনিক শ্রেণীর অভ্যুদয়ে একদিকে রাজতন্ত্রের প্রতি বিদ্বেষ অপর দিকে বিদেশী শোষকদের সঙ্গে দ্বন্দ্ব ধূমায়িত হয়ে উঠলো। দেশীয় ধনিকের যতই বিস্তার হলো, বিদেশী ধনিকের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষ অবধারিত হয়ে পড়লো। এ জন্যে বহু দেশীয় ধনিক ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের পতাকাতলে আশ্রয় নিল সমর্থনের জন্য। কিন্তু রাজপুরুষেরা সমূহ স্বার্থ-বিনাশ দেখতে পেয়েই ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের বিরোধিতা করে চল্‌লো।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ছিলেন জাতীয়তাবাদের অকৃত্রিম সেবক। তাই তিনি তাঁর আন্দোলনে যেমন এ জাতীয় ধনিকদের এনেছিলেন, তেমনি ধনিক সমর্থিত এ জাতীয়তাবাদের আন্দোলনে বামপন্থী রাজনীতিকদেরও সমবেত কর্‌তে পেরেছিলেন।

বকসার যুদ্ধ

চতুর জাপান লিওতান প্রদেশ হতে বেদখল হয়েও রুশিয়ার সঙ্গেই কর্‌লো প্যাক্ট্ (১৮৯৯)। ফলে কোরিয়ায় জাপানের স্বার্থ স্বীকার করলো রুশিয়া।

জাপান কোরিয়াকে আষ্টেপিষ্টে বন্ধন করে ফেল্‌লো। আমেরিকা 'ওপেন ডোর' নীতি বহাল রাখতে চেপে ধর্‌লো। অন্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা নিত্য নতুন কন্‌সেশন আদায় করে শক্তি বাড়ালো। তার ওপর রুশিয়া যখন লিওতান অঞ্চলের রক্ষার অজুহাতে বিপুল সৈন্য-সমাবেশ কর্‌লো, চীনবাসী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠ্‌লো।

জনসাধারণ বিদেশীদের সকল সমারোহ চীনের নামে মাত্র স্বাধীনতাকেও লুপ্ত করবার জন্য—এ কথা স্থির করে বিদেশীদের তাড়াবার জন্য দলবদ্ধ হলো। এ জাগরণ স্বতঃস্ফূর্ত্ত। তা হলেও ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের প্রচার এর ভিত্তি, এ কথা অস্বীকার করা যায় না। কারণ তিনিই তাদের দৃষ্টি খুলে দেন। সারা দেশে আলোড়ন—বিদেশী তাড়াও। কোথাও কোথাও সরকারী কর্ম্মচারীরাও এ দলের সহায়ক হলো। তাদের আশা বিদেশী শোষক বিতাড়িত হলে তারাই একমাত্র শোষক থাক্‌বে দেশে।

ক্রমে বিক্ষোভের সৃষ্টি হলো। যেখানেই বিদেশীকে দেখ্‌তে পায়, চীনারা করে আক্রমণ, করে তাদের অপমান, দেয় তাদের লাঞ্ছনা। সাধারণ লোকের সঙ্গে পরিশেষে এসে যোগ দিল কতকগুলা সরকারী সেনাদল। তবে কৃষকদের ছিল প্রাধান্য। তারা পাইপিং-এ প্রবেশ করে দূতাবাসগুলা অধিকার করে বসে।

বেগতিক দেখে সকল বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সম্মিলিত সেনাদল নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হলো। অশিক্ষিত চীনা মিশ্র বিপ্লবীদের শায়েস্তা কর্‌তে তাদের বেশি বেগ পেতে হয় নাই। যুদ্ধশেষে হলো সন্ধি (১৯০১)। বক্‌সার সন্ধির ফলে নামে মাত্র যে চীনের স্বাধীনতা তাও খর্ব্ব হলো।

সাম্রাজ্যবাদীদের সামরিক বাহিনী চীনের রাজধানী পিকিং-এর বুকে স্থায়ী আস্তানা গেড়ে বসলো।

কিন্তু বক্‌সার বিদ্রোহ হতে একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা প্রাপ্ত হয় শ্বেতাঙ্গ সাম্রাজ্যবাদীর দল। চীনে যে ভারতের মত কি দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়ার মত উপনিবেশ স্থাপনের আশা তাদের ছিল, তা একেবারে লুপ্ত হলো। তারা তাদের নীতির পরিবর্ত্তন সাধন কর্‌তে বাধ্য হলো।

জরাজীর্ণ মাঞ্চু রাজ-শক্তিকে আর আগ্‌লে থেকে কোন লাভ নাই। তারা বুঝলো দুদিন আগে হোক পরে হোক দেশের শাসন-যন্ত্র দখল কর্‌বে

ধনিক পরিচালিত জাতীয়তাবাদীর দল। তাই তাদের সঙ্গে সদ্‌ভাব রাখতে, সুব্যবহার করতে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলা এগিয়ে গেল।

তবু কিন্তু বৈদেশিক শক্তিবর্গের শোষণ-ষড়যন্ত্র বেড়েই চললো। এবার অন্য শক্তির অনুকরণে আমেরিকা ছেয়ে ফেল্‌লো চীন ও কোরিয়াকে দলে দলে আমেরিকান মিশনারী পাঠিয়ে। কোরিয়ার রাজ-প্রতিনিধি আমেরিকায় বসে এ কৌশল-জাল বিস্তার কর্‌লো। জাপানীরা প্রমাদ গন্‌লো, আর নীরব থাকা সঙ্গত হবে না, তাই তারা কোরিয়া দখল করে নিল (১৯১০)।

সম্রাটের পতন—দ্বিতীয় গণ-বিপ্লব

জাপান কিছুদিন আগে নিয়েছে ফরমোজা, আজ নিল কোরিয়া, তবু সম্রাট নীরব, পূর্ব্ববৎ উদাসীন। ওদিকে আবার রুশিয়ার দাবীতে মাঞ্চুরিয়া থেকে চীনা সৈন্য অপসারিত কর্‌তে হয়েছে। এ অপমানও মাঞ্চু-সম্রাট নতশিরে মেনে নিয়েছেন। এ রকম অন্তঃসারহীন, শক্তিরহিত রাজশক্তির অবসান ঘটিয়ে সম্রাটকে রাষ্ট্রের নিয়ম-তান্ত্রিক প্রতিনিধি করে রাখবার দাবী এল দেশবাসীর তরফ থেকে।

উত্তর চীনে বহু বিদ্বান বুদ্ধিমান ছিলেন। তাঁদের ভিতর কেন্‌ উ ওয়েই আর লিয়ান্‌ চি চো একটি দলের মুখপাত্র হয়ে শাসনতন্ত্রের অদল-বদলের জন্য সম্রাটের কাছে আবেদন কর্‌লেন। সম্রাট সানন্দে পণ্ডিত দুটিকে সরকারী উচ্চ-পদে বহাল করে শাসনের উন্নতি বিধানে ব্রতী করলেন।

কিন্তু রাজমাতা সহসা সম্রাটকে বন্দী করে রাজ্যভার হাতে নিলেন। লিয়ান চি চো ও রিফর্ম পার্টির অনেকে ধৃত হয়ে নিহত হলো। কেন উ ওয়েই বিদেশে পালিয়ে গেলেন। দেশবাসী আরও উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো। তারা ভাল করেই বুঝলো মাঞ্চু রাজবংশের অস্তিত্ব থাক্‌তে চীনের মঙ্গল নাই।

চীনের আকাশে বাতাসে বিদ্রোহের তরঙ্গ জেগে উঠ্‌লো। সবার মুখেই এক কথা—সম্রাটের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এ ভাবধারায় মাঞ্চু আর চীনা পৃথক রইলো না। এ সময়ে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন লণ্ডনে বসে তাঁর ত্রি-নীতি রচনা করে প্রবাসী চীনাদের হাতে দেশে প্রচার করলেন। বিদ্রোহ আকার ধরে উঠ্‌লো।

রাজশক্তি সকলই লক্ষ্য করলো, তারা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনকে লণ্ডন হতে বন্দী করে দেশে পাঠাতে আদেশ দিল। বিশ্বাসঘাতক চীনাদের কৌশলে

তিনি ধৃত হন। কোনও ইংরেজ পরিচারকের চেষ্টায় স্কটল্যাণ্ড্ ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের চতুরতায় তিনি ইংরেজ পুলিশের রক্ষণায় চীনাদের হাত হতে মুক্ত হন। ইংলণ্ডের পররাষ্ট্র বিভাগ তাঁকে ভাবী রাষ্ট্রনায়ক সাব্যস্ত করে চীন সরকারের আদেশ উপেক্ষা করে।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের ত্রি-নীতি চালিত বিপ্লবী দল সাধারণের সহানুভূতি সঞ্চয় ও চোর-ডাকাত-গুণ্ডার উচ্ছৃঙ্খলতা দমন করে কার্য্যে ব্রতী হলো। কিন্তু তাদের কাজ অগ্রসর হবার পূর্ব্বেই ১৯১১ খৃঃ অঃ ১০ই অক্টোবর সৈন্য বাহিনী উচাং শহরে বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। জনসাধারণ তাতে যোগ দিল। বিপ্লব কিছুটা সাফল্য লাভ করলো।

১৯১১ খৃঃ অঃ ডিসেম্বর মাসে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন বহু কষ্টে মুক্ত হয়ে দেশে ফিরলেন। দেশে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা। দক্ষিণ চীনের চৌদ্দজন গবর্ণর তাঁকে সাহায্য করলেন। বিপ্লবকে মহিমান্বিত করে অবশেষে তিনি নান্‌কিনে পৌছলেন।

তখনও উত্তর চীনে বিপ্লব তেমন ছড়ায় নাই। কিন্তু সৈন্যগণ বেতন না পাওয়ায় তারাই উত্তর চীনে বিদ্রোহী হলো। ঝুনো রক্ষণশীল প্রধান সেনাপতি ইউয়েন সি কাই-এর হাতে রাজ্যভার দিয়ে সম্রাট আত্মগোপন করে রইলেন। প্রধান সেনাপতি ও মন্ত্রী উ তিন ফুঁ বহু সভা করে বক্তৃতা দিতে লাগলেন—'বিপ্লব সফল হলেও বৈদেশিকের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হতে দিব না।' আশা ছিল তাঁদের এরূপ প্রচারে বিদেশী শক্তিরা তাঁদের সাহায্য করবে। কিন্তু কার্য্যতঃ কোন শক্তিই তাঁদের সহায়ক হলো না। অবস্থা সঙ্গীন।

১৯১২ খৃঃ অঃ ১২ই ফেব্রুয়ারী সম্রাট সিংহাসন পরিত্যাগ করলেন। ১৩ই ফেব্রুয়ারী ইউয়েন সি কাই প্রেসিডেণ্ট নির্ব্বাচিত হলেন। জনসাধারণ বেণী কর্ত্তন করলো, নারী লৌহজুতা বর্জ্জন করলো, শ্বেতসূর্য্য অঙ্কিত জাতীয় পতাকা উড্ডীন হলো। কিন্তু আফিং ত্যাগ একদিনে সম্ভব হলো না।

রাজতন্ত্র গেল না

মাঞ্চু রাজবংশ নির্ব্বিষ হলো, কিন্তু রাজা গেলেও রাজতন্ত্র গেল না। চীনে যে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলো তাতে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের গণতান্ত্রিক কর্ম্মসূচীর ভিত্তি শিথিল হয়ে গেল। ইউয়েন সি কাই সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বসবার সুযোগ খুঁজতে

লাগলেন গোপনে। সামন্ত-প্রভুরা কুওমিন্তাং-এ যোগদানের ভাণ করে বিপ্লবের আঘাত হতে নিরাপদ হয়েই ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের কর্ম্মসূচীকে করলেন অস্বীকার। তাঁরা প্রদেশে প্রদেশে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন করলেন। ক্যান্টনে স্থাপিত কেন্দ্রীয় সরকারকে তাঁরা উপেক্ষাই করে চল্‌লেন। কৃষক মজুর হতে লাগলো পূর্ব্ববৎ শোষিত। ওদিকে মঙ্গোলিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলো।

আবার একদল দেশীয় ধনিক, যারা বিদেশী ধনিকদের সহযোগী, তারা রাজতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে লাগলো। ডাঃ সান গণতান্ত্রিক দূরদৃষ্টি দিয়ে চীনের সমাজ ও বিত্ত সম্পর্কীয় বিপ্লবের যে কার্য্যধারা প্রচার করেছিলেন তার অপহ্নব ঘটে গেল। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন নানকিনে বসে রইলেন।

প্রেসিডেন্ট ও ডাঃ সান ইয়াৎ সেন

চীনের নগরে নগরে গ্রামে গ্রামে উল্লাস। বিপ্লব জয়যুক্ত হয়েছে। ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের চিত্র প্রতি গৃহের শোভাবর্দ্ধন করলো। দেশবাসী মনে করলো ডাঃ সান ইয়াৎ সেনই তাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, তিনিই তাদের সৌভাগ্য বিধাতা। এমন আনুগত্য ক'জন লোক-নায়কের জীবনে লাভ হয়!

তিনি তখন নানকিনে। প্রেসিডেন্ট সৈন্যদের মাহিনা মেটাতে পারেন না। রাজকোষ শূন্য। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী, ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের সম্মতি ব্যতীত টাকা কর্জ্জ দেয় না। তখন ডাঃ সান ইয়াৎ সেনেব সঙ্গে হলো মিটমাট্। ইউয়েন সি কাইকে প্রেসিডেন্ট বলে স্বীকার কর্‌লে তিনি কুওমিন্তাং-এ যোগ দিলেন। ডাঃ সান ইয়াৎ সেন হলেন সহকারী প্রেসিডেন্ট।

টাকা ধার পাওয়া গেল। কিন্তু চীন প্রজাতন্ত্রকে কেউ স্বীকৃতি দিল না। ১৯১৩ খৃঃ অঃ ৮ই এপ্রিল চীনের গণতন্ত্রী পার্লামেণ্ট খোলা হলো। পেরু, ব্রাজিল আর মার্কিন চীন প্রজাতন্ত্রকে স্বীকার করলো। কারণ তারা চায় রাজতন্ত্র পৃথিবী থেকে লুপ্ত হোক। তারপর অবশ্য অন্যান্য শক্তির পক্ষ থেকেও স্বীকৃতি এল।

এবার প্রেসিডেন্ট নিজ মূর্ত্তি ধরলেন। কুওমিন্তাংকে বে-আইনী ঘোষণা করলেন! ১৯১৪ খৃঃ অঃ ১১ই জানুয়ারী নিজেকে ডিক্‌টেটর বলে প্রচার করেন। পূর্ব্ব কনষ্টিটিউশন বাতিল করা হলো। তিনি স্বর্গ-মন্দিরে পূজা দিয়ে সম্রাট হবার যোগ্যতা অর্জ্জন করলেন।

অন্য উপায় না দেখে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন নতুন দল গঠন করলেন কুওমিন্তাংএর বামপন্থীদের নিয়ে। নাম হলো 'বিদ্রোহী দল'। কুওমিন্তাং-এ দু'দল হয়ে গেল। কিন্তু কৃষকের মুক্তি, মজুরের মুক্তি, সুবিধাবাদী স্বার্থান্বেষীর বিলোপ, শোষণ বিদূরিত করণ—ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের এ সকল কর্ম্মসূচীতে জনকয়েক ব্যতীত অপর সকলেই বাধা প্রদান করলো। বিশেষ করে সামন্ত-প্রভু ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তারা।

ভাড়াটে সেপাই দ্বারা বিপ্লব পরিচালনের এটি কুফল। সামরিক বাহিনীর কর্ত্তাগণ টাকার দাস। তদুপরি ধনিকদের বিরোধিতা। ডাঃ সান নতুন দল গঠন করে সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করলেন।

রুশদের নতুন ভাবধারা পর্য্যবেক্ষণ ও সে দেশ হতে যোগ্য উপদেষ্টা আনয়নের জন্য তিনি মার্শাল চিয়াং কাই শেককে মস্কো পাঠালেন। এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে, রুশিয়ায় জারের পতন হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে তিনিই সর্ব্বপ্রথম সর্ব্বাধিনায়ক লেনিনকে টেলিগ্রাম দ্বারা প্রশস্তি জানান! সে সময় চীন হতে বাহিরে টেলিগ্রাম পাঠানো সহজ ছিল না। কারণ টেলিগ্রাম ও ক্যেবল প্রভৃতি বিভাগের পরিচালনা করতো শ্বেতশক্তিরা ব্যবসা হিসাবে। আর এ সকল শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী শক্তিবর্গ রুশদের তৎকালীন রাজতন্ত্র বিলোপ-সাধন সুদৃষ্টিতে দেখে নাই বা সে শাসন-যন্ত্রকে স্বীকারও করে নাই। বহু চেষ্টার পর ডাঃ সান ইয়াৎ সেন এ টেলিগ্রাম পাঠাতে সমর্থ হন।

প্রতিদানে লেনিন-প্রতিষ্ঠিত সোভিয়েট রুশিয়া চীনের পক্ষে অহিতকর সর্ত্তে যে সকল সন্ধি-চুক্তি হয়েছিল, তা রদ করে দেয়। রুশ কনস্যেশনও চীনের বুক হতে তুলে নেওয়া হয়।

আবার রুশ নৌবহর যখন ক্যাণ্টনে এসে পৌছে, সে সময় ডাঃ সান ইয়াৎ সেনই সে বাহিনীর অধ্যক্ষকে সম্বর্দ্ধনা করেন। ডাঃ সান গোড়া হতেই রুশের পক্ষপাতী ছিলেন।

যা হোক চিয়াং কাই শেক যথাসময়ে রুশ উপদেষ্টা বরোদিন ও একদল উচ্চ শিক্ষিত নিপুণ-কর্ম্মীর আগমনের বার্ত্তা লয়ে ফিরে আসেন দেশে মস্কো হতে।

ডাঃ সান এখন হতে বরোদিনের নির্দ্দেশ মতই চলতে থাকেন।

সাম্রাজ্যবাদীরা মিথ্যা প্রচার সুরু করলো যে চীনে রুশ কমিউনিষ্ট দল প্রবেশ করে চীনকে ছারেখারে দিতে বসেছে। এ প্রচার করবে না কেন তারা!

তারা চায় চীনকে তাদের অধীন কলোনিতে পরিণত করতে। কিন্তু সোভিয়েট রুশিয়া চীনের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে চায় চীনকে সকল প্রকারে শ্বেতশক্তির সমকক্ষ দেখতে। মস্কো হতে সেরূপ সমর্থনও এল।

এবারে শঙ্কিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদীরা ডাঃ সান ইয়াৎ সেনকে 'রক্ত লোলুপ সন্ত্রাসবাদী' বলে ঘোষণা করলো সংবাদপত্র মারফত।

সাম্রাজ্যবাদীদের এই অপপ্রচারের প্রতিবাদ জানান ডাঃ সান যে, রুশ কমিউনিষ্টদের মত সাম্যবাদী সমাজ-ব্যবস্থা চীনে প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়, কারণ চীন আজও ততদূর শিক্ষিত বা রাজনীতিতে অগ্রসর হয় নাই।

সোভিয়েট প্রতিনিধি মঃ জোফও ইহা সমর্থন করেন। তিনি আরও বলেন, চীনের আজ সকলের আগে প্রয়োজন জাতীয় ঐক্য দৃঢ়মূল করা। চীনে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা যাতে হয়, সে দিকে রুশিয়া চীনকে সাহায্য করবে।

সাম্রাজ্যবাদীদের আশঙ্কা যে চীনে এখনই কমিউনিষ্ট প্রথা প্রবর্ত্তিত হবে। কিন্তু তারা ভেবে দেখলো না যে, দেশের পূর্ণ জাগরণ না হলে জন কয়েক মাত্র নেতার সাহায্যে চীনের মত বিরাট দেশে রাতারাতি সমাজতন্ত্র প্রবর্ত্তিত হতে পারে না।

বস্তুতঃ চীনের বিপ্লব-বিদ্রোহ কি রূপ নিয়ে গড়ে উঠছে তার প্রকৃত চিত্র যারা লক্ষ্য করেছেন, তারা জানেন যে, সুদূর অতীতের সেই তাইপিং বিদ্রোহের পর হতে চীনদেশবাসী শুধু সামন্ত-তন্ত্রের নির্ম্মম অত্যাচার, শোষণের বিরুদ্ধেই লড়াই করে আসছে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে নয়। কারণ সামন্ত-তন্ত্রের প্রভাবে দেশীয় ধনিকদের ব্যবসায়ে পুঁজি খাটানো প্রতিপদেই হয়েছে প্রতিহত, যেহেতু সামন্ত-তন্ত্র চীনে বিদেশী পুঁজিপতিদের সুবিধা করে দিয়ে নিজেরাও হয়েছে লাভবান্।

তাই যেদিন দেশীয় ধনিক শ্রেণী জন্ম দিল চীনে দেশীয় মিল ফ্যাক্টরী প্রভৃতির, সে দিনই বিদেশী পুঁজিপতি সামন্ত-তন্ত্রের হাতে দেশীয় ধনিকদের বিতাড়িত করতে চেষ্টা করলো ব্যবসার ক্ষেত্র হতে। সামন্ত প্রভুরা সুরু করলো দেশীয় ধনিকদের ওপর জুলুম।

কাজেই সামন্ত-তন্ত্রকে উচ্ছেদ করবার প্রয়োজনীয়তা আবশ্যিক হয়ে উঠলো। ফলে যে আন্দোলনের সৃষ্টি হলো তার স্বরূপ প্রকৃত চীন-জাতীয়তার প্রতীক নয়।

এমন অবস্থায় চীনবাসীর দৃষ্টি সহসা সাম্যবাদের দিকে পড়তে পারে না। পুরাপুরি পুঁজিবাদের বিরোধী না হলে সাম্যবাদের পথ ধরা যায় না। এ বিষয়ে দ্বিতীয় পন্থা নাই। অথচ পুঁজিবাদের অনিষ্টকারিতার প্রতি কোন নেতাই সজাগ নয়। ডাঃ সান তো পুঁজিপতিদের সঙ্গে করছেন আপোষ। তবে আর দেশ কমিউনিষ্ট হবে কি করে! নতুন ভাবধারা গণমনে স্থান পায় নাই।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের ত্রি-নীতি আলোচনা করলে দেখা যায়—জাতীয় স্বাধীনতা, গণতন্ত্র, চীনবাসীর জীবন-যাত্রার উন্নতিই ছিল তাঁর লক্ষ্য। রাষ্ট্র-নীতি হিসাবে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল—সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ, রুশিয়ার সঙ্গে মিতালি আর শ্রমিক-কিষাণ আন্দোলনের প্রগতি।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের নতুন বিদ্রোহী দল সৃষ্টি কুওমিন্তাং-সভ্য সামন্ত-প্রভুদেরও সক্রিয় করে তুললো।

প্রাদেশিক শাসনকর্তারাও দল পাকালো। প্রথম চিলি গ্রুপ। সে দল থেকেই আবার অন্য দ্বিতীয় দল বেরুলো আনফু দল। চীনের নতুন পর্য্যায়ের প্রধান মন্ত্রী তোয়ান চি জুই এ দলের নেতা। তৃতীয় দল মার্শাল চেন স্থ লিন-এর পরিচালনায় প্রতিষ্ঠিত হল। আর শেষ তো ছিল ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের বিদ্রোহী দল। কুওমিন্তাং-এ এতগুলি বিরোধী দল গজিয়ে উঠলো।

চীনের গণ-বিপ্লব যাতে কার্য্যকরী হয়; ডাঃ সান ছাড়া আর কোন নেতা সে চিন্তাও করতো না। এ দল চারটির একে অন্যে লড়াই লেগেই ছিল। অন্য নেতাদের কেবল লক্ষ্য প্রাধান্য অর্জ্জনের। তাঁর নিজ গ্রুপেরও কেউ কেউ সে উদ্দেশ্যে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতো। এ অবস্থায় কুওমিন্তাং-এর সভ্য চিও জেন নিহত হন। 'বিদ্রোহী দল' বিদ্রোহ সুরু করে, কিন্তু কৃতকার্য্য হতে পারলো না।

ক্ষোভে দুঃখে ডাক্তার সান ইয়াৎ সেন জাপানে চলে যান।

অজানার আলেখ্য

রাজনৈতিক পাঠ-চক্র

'রুশের দেহে মার্কস্‌বাদ সেরা ঔষধ হতে পারে, তা বলে ও-টা যে বিষ হবে না চীনজাতির পক্ষে তা কে বল্‌লে ?'

—আগে সমস্তটা মতবাদ পড় তারপর তর্ক করো।

—যা পড়েছি তাতে দেখ্‌ছি হিন্দুস্থানের দর্শনের মতই এটা অন্য ধরণের আজগুবি।

—না হে না, বুঝতে চেষ্টা করো, ওপর ওপর চোখ বুলিয়ে যেও না।

তরুণের দল তর্ক জুড়ে দিয়েছে পিকিন শহরের চিলি রোডে তাদের নব-প্রতিষ্ঠিত পাঠ-চক্রে, প্রকাশ্যে যা একটা ক্লাব-ঘর ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রৌঢ় একজন প্রবেশ করলেন। তরুণেরা নির্ব্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলো।

প্রৌঢ় একখানি চেয়ারে বসে গেলেন। তরুণদের বচসা তাঁর কানেও এড়ায় নাই। তিনি বল্‌লেন—

এ বই দু' পাতা পড়েই কথা কাটাকাটিতে মেতে উঠো না। মতবাদের সকল দিক না পড়ে, আলোচনা না করে তর্ক করবে না। তাতে বৃথা সময় নাশ। মোটামুটি আমি বলে দিচ্ছি, এই দৃষ্টি নিয়েই মার্কসবাদ পড়তে হয় যে, এ মতবাদ নিরালম্ব ও নিরপেক্ষ ধর্ম্ম-বিধি-বিধান-সমষ্টি নয়, জীবন ও পারিপার্শ্বিকের প্রকৃত রূপটি উপলব্ধির পথ নির্দ্দেশ ইহা, কাজেই দেশভেদে কালভেদে পাত্রভেদে এর মূল সত্য অবিকৃত রেখেও পরিবর্ত্তন-যোগ্য ও ক্রম-বিবর্ত্তনশীল অবস্থানুযায়ী পরিবর্ত্তসহ।

(Marxism is not an aggregation of absolute canons : it is an approach to life and things, adaptable to changeable and changing conditions.)

চীন-ভ্রমণকালে এরূপ বিতর্ক আমারও শুন্‌তে হয়েছে দু-এক স্থলে। তবে সব ক্ষেত্রেই জ্ঞান-গরিমায় শ্রেষ্ঠতর কর্ম্মী বা নেতা নব-দীক্ষিতদের ভুল ধারণা দূর কর্‌তে এমনি প্রকৃত মর্ম্মকথা বলে সকল সমস্যার সমাধান করেছেন।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন তাঁর ত্রি-নীতির কার্য্যক্রম স্থগিত রেখে বিদেশে চলে গেছেন। দেশ-প্লাবন যে বিপ্লব তিনি আকার দিতে চেয়েছিলেন, তা আশাপ্রদ

উন্মেষ নিয়ে দেখা দেয় নাই। চীনের বুকে বিদেশীর বিরুদ্ধতা, পূর্ণ গণ-জাগরণের অভাব, স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট দেশবাসীর রাজনৈতিক বিশ্বাস-ঘাতকতা, সর্ব্বোপরি সরকারের কূট-চাল বানচাল করে দিয়েছে তাঁর দেশ-হিত-ব্রতকে। অবশ্য যেমন গণমনে ছিল জ্ঞানের আলোর অস্বচ্ছতা, তেমনই তাঁর ভাবধারায় হয়তো ছিল কিছুটা অপরিপক্কতা। তবু তিনি দেশের দিকে দিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন যে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি তাই হয়েছে অনাগত মুক্তির ভিত্তি।

এমন সময় এল বিশ্বব্যাপী মহাসমর। প্রথম মহাযুদ্ধে চীনের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শ না থাকলেও মিল ফ্যাক্টরী ওয়ার্কশপে উৎপাদন বৃদ্ধির চাহিদা উপস্থিত হলো। রণ-নিরত জাতিগুলার সে ক্ষমতা ছিল না। ফলে বিদেশী-শাসিত কন্‌সেশনে মজুরের ভিড় জমে গেল পাড়া-গাঁ থেকে দলে দলে এসে, বিদেশীর মিলে পল্লী-বাসী অগণিত মজুর কাজে ভর্ত্তি হলো। গ্রামগুলা হয়ে পড়লো প্রায় জনহীন, শ্রীহীন।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের ঘোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও উত্তর চীনের সমরপিপাসু যোদ্ধৃ-নেতাগণ প্রথম মহাসমরে পক্ষ সমর্থন করলো। ব্রিটিশেরা চীন হতে এক লক্ষ চল্লিশ হাজার অক্‌সিলিয়ারী সেনা সংগ্রহ করে কুলি হিসাবে তাদের ইউরোপে পাঠিয়ে কলকারখানাগুলা চালু রাখলো।

কিন্তু তারা যুদ্ধশেষে ফিরে এসে তাদের অভিজ্ঞতা দেশবাসীকে জানায়—কি করে ইউরোপে শ্রমিকদল নিজেদের কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য সুরু করেছে সংগ্রাম। সে দেশেও সাম্রাজ্যবাদিগণ জনসাধারণকে শোষণ করছে। চীনের কাছে এ অভিজ্ঞতা নতুন। তবু বৎসর ধরে প্রচারে যে কাজ না হয়েছে চীনা মজুরদের বিদেশের অভিজ্ঞতা তার চেয়ে ঢের বেশি এগিয়ে দিল শ্রমিকদলকে।

১৯১৬ খৃঃ অঃ যখন ইউরোপে প্রথম বিশ্ব-সমর চল্‌ছিল, সে সময় ডাঃ সানের দেশহিতকর কর্ম্মসূচী বাতিল করে রাজতন্ত্র পুনরায় বহাল করার জন্য দেশীয় ধনিক সম্প্রদায়ের কয়েকজন ও কয়েকটি সামন্ত-প্রভু বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের একযোগে ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তোলে। তারা উয়ান নামে মাঞ্চুবংশের এক ব্যক্তিকে চীনের সম্রাট বলে ঘোষণা করতে চেষ্টা করে।

কিন্তু উয়ানের চীনে আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গেই জাতীয়তাবাদী ছাত্র সম্প্রদায় আর বিপ্লবী জনসাধারণ তার বিরুদ্ধে এমন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে যে উয়ান্‌ প্রাণরক্ষার জন্য পলায়ন কর্‌তে বাধ্য হয়। শ্বেতকায় ব্যাঙ্ক-মালিক ও ব্যবসাদারগণ

নিজেদের ভুল বুঝতে পারে। এর পরে আর কোন প্রকারে রাজতন্ত্র পুনঃ-প্রতিষ্ঠায় তারা প্রত্যক্ষভাবে কার্য্য-লিপ্ত হয় নাই।

সমরাবসানে ১৯১৭ খৃঃ অঃ রুশিয়ার জারের ঘটলো পতন, বলশেভিক দল রাষ্ট্র অধিকার কর্‌লো। যে মার্কস্‌বাদ, যে কমিউনিজম্‌ পাগলের প্রলাপ আখ্যা-প্রাপ্ত হয়ে বিশ্বজগতের কাছে হয়ে ছিল অপাংক্তেয়, সেই চির-অবাস্তব কমিউনিজ্‌ম্‌ সত্যই বাস্তব রূপ নিয়ে উদয় হলো। সে উজ্জ্বলতায় আকৃষ্ট হলো চীন।

অকেজো মনে করে যে সকল পুস্তক তাগাড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছিল, আবার সে সকলকে ঝেড়ে-ঝুড়ে তুলে এনে স্থাপন করা হলো পাঠ-চক্র। প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন রেখে তার নাম দেওয়া হলো 'ক্লাব'। সে অঙ্কুরই যে একদিন মহা-মহীরুহে পরিণত হয়ে ঘূর্ণিবাত্যা আমন্ত্রিত করবে বিশ্বের এক-তৃতীয়-গণমনে, তা কে ভেবেছিল, ক্লাবের খবরই বা তখন রেখেছিল ক'জন দেশবাসী!

কর্দ্দমময় রাস্তা, দুর্গন্ধময় নর্দ্দমা যে ক্লাব-ঘরের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করে বর্ষার বর্ষণে শীতের কুয়াসায়, নিদারুণ গ্রীষ্মে যে ক্লাবের হয়ে পড়ে ধূলি-ধূসর আভরণ-সজ্জা, সভ্য-ভব্য চীনবাসী সে দীনহীন পরিবেশ যে পরিহার করে চল্‌বে, এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই। কিন্তু দেশের যে তরুণ-দল, তাদের সন্ধানী দৃষ্টি থেকে এ ক্লাব আত্ম-গোপন করতে পারে নাই।

এমন ন্যক্কারজনক আদল নিয়ে হামেশা যে ক্লাব চীনের শহরে-বন্দরে পত্তন হয়, তাতে আড্ডা জমায় যত নেশাকর, যত উপায়হীন নিঃস্ব। আফিম্‌ চরস্‌ আর জুয়াখেলার মজলিশ হয় তার একান্ত আকর্ষণ। তাই পুলিশ প্রথমটা এটার দিকে নজরই দেয় নাই। তার পরেও নেহাৎ বেগার-শোধ করার মতই একবার হানা দিয়ে আফিম বা জুয়াড়ী খুঁজে পেল না। শুধু পেল এমন কতকগুলা লোক, যাদের প্রবীণ বয়স অন্তরের সবুজতাকে রেখেছে ঢেকে। এমনিধারা অকেজো মাথাপাগলা বুড়োদের পরিহার করে চলে গেল পিকিনের 'সেয়ানা' পুলিশ।

তরুণের দল কখন্‌ আসে কখন্‌ চলে যায়, পুলিশ তার পাত্তা পেল না। ভিতরে ভিতরে চল্‌লো বই-পড়া, আর প্রতিপাদ্য নিয়ে আলোচনা। শুধু সূক্ষ্ম বিচার-তর্ক। সভ্য-সংখ্যা বেড়ে গেল। তখন তরুণের দল ক্লাবকে নৈশ-বিদ্যালয়ে পরিণত কর্‌লো। মাসহারা দিয়ে অনেকে (যুবা-বৃদ্ধ) নতুন দর্শন পড়তে আরম্ভ কর্‌লো। এ দর্শনটির নাম দেওয়া হলো 'অজানার আলেখ্য'।

অজানার প্রকৃত এ রূপটি মনের দেওয়ালে গেঁথে নেবার জন্য তারা রুশিয়ার দিকে, রুশ-শিক্ষকের দিকে মুখাপেক্ষী হয়ে রইলো না। নিজেরাই অজানার বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে এ আলেখ্যকে চীনের কঠোর বাস্তবে রূপায়িত কর্‌তে পরিকল্পনা ছকে ফেল্‌লো।

মাঝে মাঝে ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের ত্রি-নীতি নতুন সভ্যদের উদ্‌ভ্রান্ত কর্‌তো। কিন্তু অধ্যবসায়ী চীনা-শিক্ষার্থী ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের উপলক্ষিত গণ-তন্ত্রের সঙ্গে আদর্শ গণতন্ত্রের পার্থক্য আবিষ্কার করে ফেল্‌লো। বুঝে নিল ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের গণতন্ত্রের আওতায় আজকেকার কৃষক-মজুর শ্রেণীকে বাঁচানো যাবে না।

কিন্তু এ সময়েই ক্লাবের নতুন পরিকল্পনা কার্য্যকরী করা দরকার হয়ে পডলো। বিপ্লব বিপ্লব বলে চীৎকার দ্বারা গণ-মনে পরিবর্ত্তন সৃষ্টি করা যায় না। চাই গণ-সংযোগ (mass contact), চাই গণমনকে তৈরি করা সুনিয়ন্ত্রিত বিপ্লবের পথে।

চল্লিশ কোটি যে দেশের লোক-সংখ্যা সেদেশে চল্লিশ-পঞ্চাশ জন মাত্র লোক দ্বারা কতটুকু প্রচার সম্ভব? ক্লাবের পরিচালকগণ নৈশ-বিদ্যালয় বন্ধ করে শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের পাঠিয়ে দিলেন নতুন শিক্ষার্থী সংগ্রহে। ১৯১৭ সালের শেষের দিকে নতুন ছাত্র জোগাড় হলো। কিছুদিন ধরে তাদের শিক্ষাদান চল্‌লো প্রচারের জন্য। তার পরই তাদের পাঠিয়ে দেওয়া হলো চীনের দিকে দিকে। ফলে ক্লাবঘর রইল তালা বন্ধ, শুধু বাইরের সঙ্গে সংবাদ আদান-প্রদানের ডাকঘর রূপে যেটুকু তার কাজ তাই হলো সার।

প্রচারের কাজ চল্‌লো গোপনে। কৃষক-শ্রমিকের ভিতর 'অজানার আলেখ্য' নিয়ে বিচার-তর্ক নয়, ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের গণতন্ত্রের বিরূপ সমালোচনাও নয়। প্রচারক তরুণ-দল, চাষী হয়ে মজুর হয়ে মিশে গেল শ্রমিক-দলে। কাজ হতে অবসর পেলেই তারা শ্রমিকদের দুর্দ্দশার কথা বল্‌তো। যখন শ্রমিক-দল নিজ দুর্দ্দশা বুঝ্‌তে শিখলো, তখন আপনি তাদের মনে ভাবনা এল, কি করে এ দুর্দ্দশা মোচন হয়!

সে সময় দরকার হয়ে পড়লো নেতৃস্থানীয় লোকদের যারা দেবে পথ-নির্দ্দেশ এবং যাদের কথার ওপর শ্রমিকদল হবে আস্থাবান্‌।

১৯১৭ খৃঃ অব্দে আবার জাপানের চেষ্টায় মাঞ্চু-রাজবংশের অপর এক ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাবার প্রয়াস চলে। ব্যাপারটা সঙ্গোপনে খাড়া করার তোড়জোড়

করা চল্‌লেও চীনের জাতীয়তাবাদীরা সংবাদ পেয়ে যায়। তাকে তখন হত্যা করার এমন চেষ্টা চলে চতুর্দ্দিক হতে যে, সে অবশেষে ওলন্দাজ দূতাবাসে আশ্রয় নিয়ে অতি কষ্টে প্রাণ বাঁচাতে সক্ষম হয়। এর পর আর এ জাতীয় কোন লোক এমন অসমসাহসিক ষড়যন্ত্রে পা বাড়ায় নাই।

মিঃ ওয়াং

চীনের কৃষক ও মজুরদের প্রতি শোষণ-শাসন যা ছিল পৃথিবীর অন্য কোথাও সেরূপ দেখা যায় না। কারণ সামাজিক উৎপীড়ন ছিল সৃষ্টিছাড়া। বেণী কর্ত্তন, লৌহ-পাদুকা বর্জ্জন—এতেও সেদিকে অবস্থার কোন উন্নতি হয় নাই। তবু কিন্তু এদের জাতিভেদ কোনকালে ছিল না, শ্রমের কাজেরও বেশ মর্য্যাদা ছিল। তা হলে কি হবে, অদৃশ্য জাতিভেদ ছিল সেটা টাকার কৌলীন্য, আর শ্রমের মর্য্যাদা ছিল অর্থাগম-বিহীন।

কাজেই বয়সে তরুণ প্রচারকদলের কথায় যখন শ্রমিকদের হল নতুন দৃষ্টি, দেখতে পেল তাদের নির্ম্মম শোষণ আর অকারণ শাসন, তখনই তারা বিদ্রোহের দিকে বিপ্লবের দিকে এগিয়ে চল্‌লো। আর এ সময়েই প্রয়োজন হলো কর্ম্মী-নেতার।

পিকিনের চিলি রোডে যে দলের সৃষ্টি, তা-ই কিন্তু আজকেকার কমিউনিষ্ট দলের গোড়া পত্তন (১৯২০)। চিলি রোডের কর্ম্মিগণ মজুরদের ভিতরেই কাজ করেছিলেন বেশি, চাষীদের ভিতর ততটা নয়। কিন্তু তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক প্রথায়। মজুরদের কখনও উচ্ছৃঙ্খল হতে দেন নাই। এ ভাবে কাজ করেছিলেন বলেই শুধু মজুর একক নয় সমগ্র পরিবারের নর-নারীই পেয়েছিল নব-দৃষ্টি।

তথাপি সেদিন কমিউনিষ্ট দলের সভ্য হওয়া সোজা ছিল না। প্রাণ বিপন্ন করার কথা তো রয়েছেই, তদুপরি হাতে-কলমে কাজ করে প্রমাণ করতে হতো যে সভ্য হবার মত যোগ্যতা অর্জ্জন হয়েছে, তবে সে ব্যক্তিকে সভ্য পদ দেওয়া হতো। নইলে শুধু মার্কসবাদ পড়ে বা বক্তৃতা দিয়ে সে অধিকার লাভ হতো না। এ ভাবে নিতান্ত হিতৈষী বন্ধুর মত, সহকর্ম্মীরূপে, সুখ-দুঃখের ভাগী হয়ে তরুণ-দল চীনের ভূমিহীন চাষী ও গৃহহীন মজুরকে ভাই বলে বুকে টেনে নিয়েছিল, যাদের দেশের ধনিক সম্প্রদায় দিয়েছিল দূরে

ঠেলে, দাঁড়াবার ঠাঁই দেয় নাই, মানুষের প্রাথমিক অধিকার থেকেও করে রেখেছিল বঞ্চিত, রিক্ত।

শুধু গণ-সংযোগের উদ্দেশ্যে নয়, কর্ম্মী-সংগ্রহের জন্যও মজুবদের নিকট যেতে হয়েছিল প্রচারক-দলের। যে দেশে শতকরা আশিজন কৃষক ও মজুর সেদেশে কর্ম্মী তো আসবে সে-শ্রেণী থেকেই বেশি।

প্যারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র মিঃ ওয়াং ফিরে এলেন দেশে। ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের দেশব্রত তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল। শিক্ষা সমাধা করে এসে ডাঃ সানের উপদেশে কাজে প্রাণ-মন সঁপে দিলেন। দেশের তখন অতি দুর্দ্দিন। দুর্দ্দিন মোচনের ইচ্ছা থাকলেও দেশবাসী অনেকেরই অভাব সংসাহসের, অভাব আন্তরিকতার। মিঃ ওয়াং-এর প্রাণ কেঁদে উঠ্‌লো।

তখন আর কুওমিন্তাং পার্টি তাঁকে বেঁধে রাখতে পারলো না। বিশ্বের আন্তর্জ্জাতিক পরিস্থিতি তাঁর দৃষ্টি দিয়েছে খুলে। কুওমিন্তাং পার্টিতেও গড়ে উঠেছে দু'দল। ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের গোঁড়া ভক্ত, আর সুবিধাবাদীর-দল, গণ-মন হতে তারা দূরে, তাদের সংস্পর্শ-রহিত যেন। এসব দলের গতানুগতিক ধারার প্রতি, প্রকৃত চীনের প্রাণ-শক্তিকে অস্বীকার করবার প্রবৃত্তির প্রতি কোন আকর্ষণই ছিল না স্বাধীন চিন্তাশীলদের।

তাই মিঃ ওয়াং দেখলেন সম-মতাবলম্বী দেশবাসীকে এক পতাকা-তলে একত্রিত করতে হলে চাই কাজ। কাজের অগ্নি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে তবে কর্ম্মী আখ্যা পাবেন আর পাবেন বিপ্লবী মনোবৃত্তি-সম্পন্ন দেশবাসীর সমর্থন। তখন গঠিত দলকে তিনি পারবেন চির সত্যের পথে চালিত করতে।

অজানার আলেখ্য দেশের বহু যুবা-বৃদ্ধের মনে যে সত্যের ছাপ এঁকে দিয়েছে, তাতে তো দল আপনা-আপনি গঠিত হয়ে উঠেছে, যদিও সঙ্গোপনে আর শিথিল যোগাযোগে। এখন তিনি চাইলেন স্বার্থলেশহীন কার্য্য-দ্বারা সে দলকে আরো নিবিড় সংস্পর্শে আনয়ন করতে।

তাই একদিন তিনি এসে হাজির হলেন হাংকো নগরীর বুকে। প্রথম ত্যাগ হলো তাঁর ইউরোপীয় পোষাক। সে পোষাক বিক্রি করে মোটা টাকাই পাওয়া গেল বলতে হবে। চীনা পোষাকে সজ্জিত হয়ে গরীব-দুঃখীর সঙ্গে ভাই বলে মিশেও তাঁর আশ মিটলো না। তবে কি পাশ্চাত্য শিক্ষার ভুয়া আভিজাত্য তাঁর পথের কাঁটা হয়ে আছে?

এক এক করে তিন দিন কাটবার পর তিনি পেলেন আলোকের সন্ধান : সেদিন ভোরবেলা একজন পাঞ্জাবী পুলিশ চীনা রিক্সা-বাহক একটিকে প্রহার করতে করতে থানায় নিয়ে যাচ্ছে। মিঃ ওয়াং ইচ্ছা করলে লোকটাকে ছিনিয়ে নিতে পারতেন পুলিশের হাত থেকে। কিন্তু তিনি তা করলেন না। ছুটে গেলেন এক রিক্সা-কারখানার মালিকের কাছে। রিক্সা-বাহক বলে পরিচয় দিয়ে এবং নিয়মমত টাকা জমা রেখে তখনই রিক্সা-বাহকের পেশা সুরু করলেন।

প্রতিদিন রাতের বেলা সকল রিক্সা-বাহককে ডেকে বুঝাতে আরম্ভ করলেন কেন বিদেশীরা তাদের প্রতি করে অত্যাচার, কেনই বা চীনের জন-সাধারণ তাদের ওপর সদয় নয়। সবার ওপর এক ব্যবসায়ের লোকগুলার যদি থাকে একতা, তা হলে সবাই সমীহ করে চলে। তাদের দুর্গতির কারণ যখন তারা বুঝ্‌তে শিখ্‌লো, তখন মিঃ ওয়াং প্রস্তাব করলেন রিক্সা-পুলার ইউনিয়ন গঠনের।

তাদের ভিতর কেউ কেউ বল্‌লে—ইউনিয়ন গঠন করে একজোট হয়ে পারিশ্রমিক বাড়ানো যাবে সত্য, কিন্তু এ কাজে যেন হীনতা, যেন বাহক পশুর সম-শ্রেণীতে নেমে যেতে হয়। অন্য কোন পেশা বাৎলে দিতে পারেন ?

—আপাততঃ নয় বন্ধু। চীনে আগে কৃষক-মজুর রাজ স্থাপিত হোক। সোভিয়েটে দেখ্‌ছো না সবাই শ্রমিক, অথচ পশু-বৎ হীনতা তার কোথাও নেই। আমরাও পশুত্বকে দেব নির্ব্বাসন। কিন্তু সে অবস্থা পেতে হলে সকল শ্রেণীর একতা চাই, চাই সাম্য। আর তারই প্রথম সোপান হল রিক্সা-পুলার্‌স্‌ ইউনিয়ন।

ইউনিয়ন গঠিত হলো। এদের একতার প্রভাবে বিদেশীরা হলো জব্দ। হাংকো হতে ব্রিটিশ কন্‌সেশন তুলে নিতে বাধ্য হলো। 'মরণবিজয়ী চীন' যাঁরা পাঠ করেছেন তাঁরা জানেন কি ভাবে কি মূল্যে তা সম্ভব হয়েছিল। আর একথাও তাঁরা জানেন যে মিঃ ওয়াং-এর সাক্ষাৎ না মিললেও চীন ভ্রমণকালে, তাঁরই কর্ম্মক্ষেত্রের মাঝে বিচরণ করে পেয়েছিলাম তাঁর ব্যক্তিত্বের—নেতৃত্বের পরিচয়। সংগঠন-কার্য্যে মিঃ ওয়াং-এর কৃতিত্বই তাঁকে নেতার আসন দান করেছিল। কিন্তু জাপানের আর চীন সরকারের বিরোধিতায় মিঃ ওয়াং'কে আণ্ডার গ্রাউণ্ড দলে আত্মগোপন করতে হয়েছিল।

হাংকোর পর একে একে চীনের বড় বড় শহরগুলায় এ অনুকরণে ইউনিয়ন গঠিত হতে লাগলো। ইউনিয়নগুলার প্রতি বিদেশী ও দেশীয় ধন-কুবেরগণ

উপেক্ষার দৃষ্টিই দান করেছিলেন এই মনে করে যে, এটা সরদার-কুলির নিয়ন্ত্রণে ধনিকের অনুকূল কমোডোর প্রথায়ই চালিত হবে। কিন্তু এ সরদার কুলি (অর্থাৎ কমোডোর) যারা মনোনীত হলো তারা যে কমিউনিষ্ট পার্টির শিক্ষিত সম্প্রদায়, আর তারা যে কুলির কাজে আত্মগোপন করে প্রবেশ করেছে, একথা ধনিকেরা সন্দেহ করতে পারে নাই।

তার কারণও যে ছিল না, এমন নয়। চীনে কোন দিনই শ্রমের কার্য্য হেয় ছিল না। অনেক শিক্ষিত শ্রেণীর লোকও অবস্থা-বিপর্য্যয়ে শ্রমিকের কাজ করতে বাধ্য হতো। আর সে কাজ গ্রহণে কোন কুণ্ঠা-সঙ্কোচ তাদের থাকতো না, যেহেতু চীনে কেরানিও শ্রমিক, মেথরও শ্রমিক ; কোন অপকৃষ্টতার ভার সে সব পেশার ওপর আরোপিত হতো না।

কাজেই যত ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠিত হলো সবেরই মস্তিষ্ক হয়ে পড়লো শিক্ষিত ছাত্র আর বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। কিন্তু কমিউনিষ্ট পার্টির এ চতুর কার্য্য-ক্রম আর বেশি দিন গোপন রইলো না।

লি তা চাও

পিকিন নগরীর বাইরে হাংকো-পিকিন লাইনে একটা ওয়ার্ক-হাউস ছিল। বহু সংখ্যক মজুর সেখানে কাজ করতো। মজুরী মিলতো অতি সামান্য, যেমন তখনকার দিনে রেওয়াজ ছিল চীনে, কিন্তু এদের বাসের জন্য কোনই ব্যবস্থা ছিল না। ওয়ার্কস্ ম্যানেজার ছিলেন একজন ইংরেজ। তাঁর কাছেই মজুরেরা আবেদন জানালো তাদের কোয়ার্টারস্-এর ব্যবস্থা করে দিতে। মজুরগণ নিজেদের অভাব অভিযোগের অনেকটা মুক্ত দৃষ্টি পেয়েছে, কারণ সদ্য ইউরোপ হতে প্রত্যাগত মজুর তাদের ভিতর ছিল। তাই প্রথম দাবী হলো বাসস্থানের।

ওয়ার্কস্ ম্যানেজার প্রথমটা এড়িয়ে গেলেন এই বলে যে, কুলিদের বাসস্থান তাদের নিজেদেরই খুঁজে নিতে হবে, কর্তৃপক্ষ এ নিয়ে কিছু করবে না। কিন্তু চীনের মজুর আর মেষ-শাবক নাই। তারা লিখিত আবেদন পেশ করলো। তখন ম্যানেজার কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে রাজি হয়ে, আবেদন-পত্রে সুপারিশ করে পাঠিয়ে দিলেন। মজুর-দল ধৈর্য্য ধরে রইলো উত্তরের অপেক্ষায়।

কিন্তু জবাব এল না। মজুরগণ অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। তখন ম্যানেজার স্বয়ং উপস্থিত হলেন মালিকদের নিকট মজুরদের জন্য দরবারে। কর্তৃপক্ষ অটল,

ম্যানেজারকেই শ্লেষ করে বলে দিলেন—কুলির জন্য যদি এতই দরদ তাঁর, তিনি পকেট থেকে টাকা খরচ করে কুলি-বস্তি তৈরি করে দিতে পারেন।

জবাবে অপমানিত মনে করে ইংরেজ ম্যানেজারের বুলডগ্ টেনাসিটি চাগাড় দিয়ে উঠলো। তিনি কাজে ইস্তফা দিলেন। বিদায় বেলায় মজুরদের ধর্ম্মঘট করতে পরামর্শ দিয়ে ওয়ার্ক-হাউস ত্যাগ করলেন। ডাঃ সানের পার্টির পরিচালনায় মজুরগণ কর্‌লো ধর্ম্মঘট। চীনদেশে ইহাই উল্লেখযোগ্য প্রথম ধর্ম্মঘট। (১৯১৮)

কর্ত্তৃপক্ষ মোতায়েন করলো লিগেশন্ রক্ষী সিপাহী-দল। তারা আদেশমত ধর্ম্মঘটী মজুরদের ওপর করলো নির্ম্মম নির্য্যাতন। অনেক মজুর প্রাণ হারালো গুলীর দাপটে, কতকগুলার হলো শিরশ্ছেদ। কেউ কেউ পালিয়ে গেল। কিন্তু এই যে বিদেশী সিপাহী-সাহায্যে অত্যাচার, এর ফল হলো বিপরীত। মজুরেরা দমে না গিয়ে রাজনীতিক পার্টির শক্তি বৃদ্ধি করলো, তাদের দলের কর্ম্মী হয়ে যোগদান করে। পার্টির ভিত্তি দৃঢ় হয়ে উঠ্‌লো।

এ ধর্ম্মঘট নিয়ন্ত্রণ করেছিলেন লি তা চাও। যেমন তিনি উচ্চ শিক্ষিত, তেমন দুর্জ্জয় সাহসী। তিনি মিঃ ওয়াং-এর মত কর্ম্মী-নেতা হলেও আণ্ডার-গ্রাউণ্ড থাক্‌তে চান নাই। তাঁর কাছে সত্য যা, তা প্রকাশ, তা আলোক, তাতে কোন গোপনতার পক্ষপাতী তিনি ছিলেন না। কিন্তু তাঁর এ সরলতার জন্য মূল্য দিতে হলো চরম।

পিকিনে এর পরও আর দুবার ধর্ম্মঘট হয় ১৯২৩ ও ১৯২৬ খৃঃ অঃ বিশেষ করে ছাত্র আন্দোলনের ফলে।

লি তা চাও মজুর-শ্রেণীর ভিতর ঘুরে ঘুরে কাজ করে চল্‌লেন। প্রয়োজন হলেই সংগঠন কার্য্যে তিনি করতেন শফর। শফর শেষে ফিরে এসে বিশ্রাম নিতেন পিকিন শহরে। তখন শ্রমিক ইউনিয়ন গঠিত হয়েছে মন্দ নয়, তাদের যেন একটা সম্ভ্রমও জন্মলাভ করেছে দেশবাসীর চোখে। আর টনক নড়ে উঠেছে ধনপতি-দলের।

মাঞ্চুরিয়া থেকে শাসনকর্ত্তা এলেন্ চেন সু লিন। কমিউনিষ্ট-বিদ্বেষী বলে তাঁর নামডাক দেশজোড়া। কমিউনিষ্টদের তো বটেই, বাগে পেলে চীনের যারা দক্ষিণ পন্থী (আমাদের দেশে যাকে বলে বামপন্থী) তাদেরও নিস্তার থাকে না চেন সু লিন-এর হাতে। মাঞ্চুরিয়া হতে বদলি হয়ে তিনি এখন হলেন পিকিনের শাসনকর্ত্তা। তিনি কর্ম্মী-নেতা লি তা চাও-কে হত্যা কর্‌লেন।

কমিউনিষ্ট পার্টি ও তাদের সমর্থক উগ্র কুওমিন্তাং বাম-পন্থীদের ভিতর বেশ আলোড়নের সৃষ্টি হলো। কিন্তু হাতে হাতে প্রতিবিধান করবার মত অবস্থা তখন তাদের ছিল না। তারা প্রচারে আর কর্ম্মীসংখ্যা বর্দ্ধনে নিরত হলো।

পিকিনের ধর্ম্মঘট আর পরিচালক লি তা চাও-য়ের হত্যা ইন্ধন জোগালো, কর্ম্মীর সংখ্যা প্রচুর বেড়ে গেল। শিক্ষিত ছাত্রদের সার্থক প্রচারে এবার দেখা দিল কৃষক আন্দোলন।

কৃষক আন্দোলন

চীনের শিক্ষিত ছাত্রকর্ম্মীরা ছিল অধিকাংশই গরীব। তাদের পক্ষে ঘরে বাইরে সমানই আদর। কাজেই ঘরের বার হতে তাদের কোন কুণ্ঠা নাই, কারণ তারা আদর-অনাদরকে কোনকালে গ্রাহ্য করে নাই। কৃষক আন্দোলনের গোড়ায়ও তাদেরই কর্ম্ম-তৎপরতা। বহু প্রাচীন কাল হতেই চীনের কৃষক গড়ে রেখেছিল মজুরদের জন্য আশ্রয়-গৃহ আর ব্যবস্থা করতো তাদের আহারের। এ রকমভাবে আশ্রয়ে বন্দী না করলে সময়মত যথোচিত কাজ পাওয়া যায় না, তাদের ওপর সকল রকমে প্রভাবও বিস্তার করা যায় না। যদিও এ রেওয়াজ বাইরে থেকে দেখতে আমেরিকার কৃষকের রেষ্ট হাউস তৈরির মত, তবু সে পরিচ্ছন্নতা, সে উন্নত জীবন-যাপন প্রণালীর কোন ব্যবস্থাই চীনা কৃষকের ছিল না।

পেট ভরে খাওয়া আর রাতে শোবার স্থানই মিলতো কৃষি-মজুরদের, এর বেশি কিছু নয়। তাতেও চীনা কৃষককে বেগ পেতে হতো না, যেহেতু কৃষক-পত্নী করতো রান্না, আর সাধারণ খাদ্য তো ঘরেই থাকতো। পাচিকা চীনা-কৃষককে রাখতে হয় নাই। ঘরে যদি স্ত্রী না থাকে তখন বিবাহ না করেই স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করে পাচিকার অভাব মিটাতো। অনেকক্ষেত্রে যে মজুর-স্ত্রীকে কুক্ষিগত করা না হতো এমনও নয়। কাজেই চীনা-কৃষক ছিল তার ভুবনের রাজা। ডানপিটে-পনায় আইন-ভঙ্গ করায় তাদের একটুও বাধতো না। মজুরেরা মুখ বুজে সব সয়ে যেতো।

এমন যে প্রতাপশালী বেয়াড়া কৃষক, তারা কিন্তু ভূমির মালিক নয়, তাদের ওপর শোষণ চলতো জমিদারদের। আর এমনি কৃষি-মজুরের আশ্রয়াবাসে স্থান গ্রহণ করে চীনা তরুণের দল মজুরী করেই ছড়াতে লাগলো তাদের অগ্নিময় প্রয়োচনা-বাণী। তবে সে কার্য্য সহজ হয় নাই আদপেই।

ছাত্রদের কথায় কৃষি-মজুরদের প্রথমই আক্রোশ হলো কৃষকের ওপর, তার অবহেলায় আক্রোশ ঘৃণায় পরিণত হলো, দেখা দিল বিদ্রোহের সূচনা। কৃষক নিজেও শোষিত, শাসিত। তার দুনিয়া জ্বালাময়, মজুরদের বিরোধিতায় সে হলো ক্ষিপ্ত; তার অসাধ্য তখন আর কিছু রইলো না। নৈতিক উচ্ছৃঙ্খলতা সঙ্গের সাথী ছিল, এখন সকল রকমে বাধাহীন বেপরোয়া হয়ে উঠ্‌লো।

এ-দুই বিরোধী-শক্তির সামঞ্জস্য করলো ছাত্রগণ—কৃষক ও মজুরদের তৃতীয় শক্তির বিরুদ্ধে বিদ্রোহী করে। মজুরদের কাজে নামাতে তরুণেরা অষ্টপর তাদের প্রশ্ন করতো—কাজ তো করবে বা করছো, খাওয়া হয়েছে? পেট যাদের ক্ষুধার জ্বালায় জ্বল্‌ছে তাদের ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়ার কথা স্মরণ করিয়ে দিলে, তারা হয় মরিয়া। তখন তারা ক্ষুধা-নিবৃত্তির আশায় যে-কোন অপকর্ম্ম করতেও কুণ্ঠিত হয় না।

ছাত্রদের প্রচারে কৃষক ও মজুর উভয়েই বুঝলো নিজেদের উপায়হীন অবস্থা, আর বুঝলো যে তারাই চীনের প্রকৃত আহারদাতা, তারা যদি হাত গুটায় তবে তাদের যে শোচনীয় দুরবস্থা হবে তার চেয়ে শতগুণে বেশি দুর্দ্দশা হবে জমিদার আর ধনিকদের।

চীনদেশে ভ্রমণকালে কৃষক ও কৃষি-মজুরদের অতি নিকৃষ্টতম জীবন পাত করতে দেখেছি, আবার দেখেছি তাদের সকল জুলুম সকল শোষণে গা-সহা নিরঙ্কুশ হয়ে বেঁচে মরে থাকতে, আবার এও দেখেছি যে মজুরেরা কৃষকদের মতই ডানপিটে। তাদের দুর্দ্দশার কথা, তার প্রতিকারের কথাই আমি বলতাম তাদের যখনই সুযোগ মিল্‌তো। অনেকে রাগ করে আমায় তাড়িয়ে দিত। আবার যাদের চোখ ফুটেছে তারা বসে বসে আলোচনা করতো। অন্তরালে শুনতাম ওরা বলছে—কালো ভূতটা আর যা-ই হোক আসল জায়গায় ঘা দিতে জানে!

সাংহাই ধর্ম্মঘট

পিকিনের ধর্ম্মঘটের পর সাংহাই নগরীতে ধর্ম্মঘটের তোড়জোড় সুরু হয়। মজুরী-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, বিদেশীদের শায়েস্তা করবার লক্ষ্যে। ছাত্রদের বিক্ষোভই এ ধর্ম্মঘটে হয় প্রবল। তার ওপর শ্রমিক শ্রেণী। চীনের ছাত্রসমাজ এ সময়ে যথেষ্ট বহির্জ্জগতের সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত। যত যুগান্তরকারী ভাবধারা প্রকাশিত হয়েছে যুবসমাজ তা রীতিমত পাঠ করেছে। ওয়েল্‌স্‌, রোমাঁ রোলাঁ,

মার্কস, লেনিন, হুইটম্যান, গোর্কি—কিছু তারা বাদ দেয় নাই। অন্ধকার ভবিষ্যতে তারা আশার আলো ফুটালো নতুন জীবনের সন্ধান দেশময় প্রচার করে।

কল-কারখানার মজুর, রিক্‌সা-পুলার হতে আরম্ভ করে যত প্রকারের যান-বাহনের চালক—সবাই করলো ধর্ম্মঘট। চাপাই হতে চীনা টাউন পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র সমান অবস্থা। কুওমিন্তাং পার্টির বাম-পন্থীরা পদে পদে মজুরদের করলো সহায়তা। সাংহাই ধর্ম্মঘট চীনের সর্ব্ববিখ্যাত ধর্ম্মঘট, যার নির্ম্মম নিপীড়ন সংবাদ সারা বিশ্বে প্রচারিত হয়।

কিন্তু বিদেশী শক্তিগণ এ ধর্ম্মঘটের আভাস আগেই পেয়েছিল। ব্রিটিশেরা শিখ-পাঠান ফৌজ মোতায়েন করলো কারখানায়, কন্‌সেশনে। পাঞ্জাবী শিখ ও অন্য ভারতীয় কেরানির দল সন্ধানীর কাজ করে গোপন ষড়যন্ত্র চালিয়ে ব্রিটিশ প্রভুর প্রসাদ লাভ কর্‌লো। তাদের ভিতর কলিকাতাবাসী শিক্ষিত ব্যক্তিও কয়েকজন ছিল, যাদের পরোক্ষ ইঙ্গিতে চীনের বুকে চলেছিল হত্যার তাণ্ডব।

ফরাসী কনসেশন হতে আনামী, সোমালী, সিংহলী, আর ফরাসী ফৌজ দলে দলে এল। চীনার রক্তে সাংহাইয়ের রাজপথ রক্তাক্ত হল। তাদের সঙ্গে যোগ দিল আমেরিকান্ পল্টন—যে চীনাকে দেখতে পেল তাকেই করলো হত্যা। যদিও নারী আর শিশুর ওপর সেনাদল চড়াও হয় নাই, তথাপি বিপুল সে সেনাদলের পদ-আস্ফালনে অনেক শিশু হয়েছে নিরুদ্দেশ, অনেক নারী হয়েছে হতাহত।

হত্যার ভয়াবহ কাহিনী প্রচারিত হলে ওয়াং চি ওয়াই আর স্থির থাক্‌তে পারলেন না। বিবৃতি প্রকাশ করে, ছাত্র মহলে উত্তেজনার সৃষ্টি করে বেড়াতে লাগলেন। কিন্তু ছাত্রগণ চীনা মজুর-দলকে নির্লিপ্ত রাখ্‌লো, এই জন্য যে—যে পর্য্যন্ত না ঘরের শত্রু বিশ্বাসঘাতক চীনা যুদ্ধ-নেতারা দমিত হয়, ততদিন বিদেশী শক্তিদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিবিধান সম্ভব নয়। সে বিশ্বাসঘাতকেরাই বিদেশী শক্তির পরিপোষক ও সুযোগদানকারী।

উঁ পে ফুঁ বনাম চেন স্থ লিন্

মার্শাল চেন স্থ লিন্ গোপনে গোপনে জাপানী ও ব্রিটিশের সাহায্যে ও প্ররোচনায় পিকিন আক্রমণ করতে অগ্রসর হয়। উদ্দেশ্য মার্শাল উঁ পে ফুঁকে বিতাড়িত করে স্বয়ং ক্ষমতা অধিকার করা। আর তা হলেই গোপন বিদেশী

বন্ধুরাও নিশ্চিন্তে শোষণ চালাতে পারে। কারণ পিকিন হলো বিপ্লবী চীনের মুকুটমণি।

কিন্তু ছাত্র ও সাধারণ লোক সন্দিগ্ধ হয়ে মার্শাল উ পে ফুঁর পক্ষে যোগদান করলো। ফলে চেন সু লিন পরাস্ত হলো। কিন্তু সহজে দমে যাবার মত লোক সে নয়। আবার নব উদ্যমে চড়াও হলো পিকিনের ওপর। এবার উ পে ফুঁ সাহায্য গ্রহণ করলেন একটি খৃষ্টান জেনারেলের নাম তার ফেং উ সেন। খৃষ্টান জেনারেলটি চেন্ সু লিনের আক্রমণ প্রতিরোধ করে তাকে পরাস্ত করেন।

ক্ষমতার লোভ বড় ভয়ানক। খৃষ্টান জেনারেল সে লোভ সামলাতে পারলেন না। জেনারেল ফেং দুদিন পরেই উ পে ফুঁকে প্রতারিত করে পিকিনের সর্ব্বময় কর্ত্তা হয়ে বসেন। মার্শাল উ পে ফুঁর তখন রাজনীতি হতে ও বিপ্লবী চীনের যোগ্রাযোগ হতে বিদায় গ্রহণ করা ছাড়া উপায় রইলো না।

তিনি প্রকাশ্য পাদ-প্রদীপের আলোক হতে অন্তর্দ্ধান করলেও ছাত্র আন্দোলন ও কৃষক-জাগরণের দিকে বিশেষ দৃষ্টিদান করেন। আমার মাঞ্চুরিয়া-ভ্রমণকালে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তখন তিনি গোপনে মজুরদের আন্দোলন চালাচ্ছেন।

সে সময় মাঞ্চুরিয়ায় জাপানের জোর-জুলুমে শহর-গ্রাম অধিকারের বিরুদ্ধে চলেছে সশস্ত্র বিপ্লব। উ পে ফুঁর আহ্বানে পিকিনের বহু মেডিক্যাল ছাত্র প্রাণ বিপন্ন করেও সে বিপ্লবে যোগদান করে।

গেরিলা-দল

'মসকুইটো মাদার' আখ্যাপ্রাপ্ত বৃদ্ধা চীনা-রমণী চীনে সর্ব্বপ্রথম গেরিলা ফৌজ গঠন করেন—কৃষি-মজুর আর তরুণ তরুণীদের নিয়ে। তাঁর নিজের পুত্র-কন্যাও সে দলে ছিল। জাপান সরকার একদল রক্ষি-সেনা দিয়ে হয়তো সমর-সম্ভার মাঞ্চুরিয়া পাঠাচ্ছে অথবা মাঞ্চুরিয়া হতে তূলা গম প্রভৃতি কাঁচামাল স্বদেশে পাঠাচ্ছে। সন্ধানীরা গোপনে সে সংবাদ এনে জানায় গেরিলাদের। গেরিলারা চাষের ক্ষেতে কাজ করছিল, সে অবস্থায় আর সে পোষাকেই তারা চট্পট্ ঝোপ-ঝাড়ে লুকানো অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে গিয়ে রক্ষি-দলের ঘাড়ে পড়লো। আকস্মিক আক্রমণে রক্ষি-দল হতাহত হলো, গেরিলারা সে কাঁচামাল বা গোলাগুলী লুঠ করে নিয়ে বিলিয়ে দিল গ্রামবাসীদের ভিতর। আবার পরমুহূর্ত্তেই ক্ষেতে এসে কাজ সুরু করে দিল অস্ত্রাদি লুকিয়ে রেখে। জাপান সরকার কোন সন্ধানই

এদের পায় না গ্রামবাসীর চতুরতায়। এমনি করে গণমনে বিপ্লবের বীজ বপন করে কর্ম্মীদের ওপর দেশবাসীর সমর্থন আনয়ন করে বৃদ্ধা মস্‌কুইটো মাদার করেছিলেন গেরিলা-বাহিনী।

তাদের ভিতর যারা ছিল শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী তারাই এসে মাঞ্চুরিয়ায় তৈরি করে ফেললে নতুন গেরিলা পল্টন। মার্শাল উ পে ফু আর জেনারেল মা চন্দ্‌সানের চতুর পরিচালনায় এ গেরিলা-দল জাপানী ধ্বংস, জাপানীর ক্ষতি-সাধনের বহু কাজ করে যেতে লাগলো।

জাপানের বোমা বর্ষণে নিহত মার্শাল চেন্‌ সু লিন্‌-এর পুত্র মার্শাল চান্‌ সুয়ে লিয়াং-এর প্রবল ইচ্ছা ছিল জাপানের হাত হতে মাঞ্চুরিয়া উদ্ধারের। কিন্তু নানকিন্‌ সরকার তাঁর ওপর রাখতো প্রখর দৃষ্টি, তিনি প্রকাশ্যে যোগাযোগ রাখতে পারতেন না, সাহায্য করতেও ভরসা পেতেন না বিপ্লবী-দলকে।

এখানে মনে রাখতে হবে যে বিপ্লবী, ব্যান্‌ডিট, গুণ্ডা প্রভৃতি নাম সাম্রাজ্যবাদী বিদেশীরা কমিউনিষ্ট পার্টির ওপরই আরোপ করতো, দুনিয়ার কাছ হতে এদের সঙ্ঘবদ্ধতা, এদের অসমসাহসিকতা ও এদের রাজনীতিক হিসাবে প্রগতি গোপন রাখবার জন্য। চীনা ধনিকগণ বিদেশীর হাতধরা বলে তারাও সে অনুকরণ করতো। শুধু তা নয়।

ভেদ-নীতি

বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা প্রথম চেষ্টা করে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করতে। চীনের মুসলমান বরাবরই দেশব্রতী। কন্‌ফিউসিয়ান ও বৌদ্ধ চীনাদের উস্কানো হলো তাদের বিরুদ্ধে। বিদেশী শক্তির ইঙ্গিতে নান্‌কিন্‌ সরকার উত্তর চীনে বিশেষ করে মাঞ্চুরিয়ায় এ চেষ্টা সুরু করলেন। কিন্তু চীনের মুসলিম প্রকৃত শিক্ষিত— রাজনীতি ক্ষেত্রেও তাদের দান অশেষ। তারা অসীম ধৈর্য্যশীল। জেনারেল মা চন্দ্‌-এর সাহায্যে ও নিয়ন্ত্রণে তারা সাম্যবাদী হয়ে উঠেছিল।

মুক্‌দেনে থাকার সময় দেখেছি নান্‌কিন্‌ সরকারের সাম্প্রদায়িকতা সৃষ্টি নিষ্ফল হয়েছিল। সে সময় একদিকে জাপানীদের অত্যাচার, অন্যদিকে বিদেশী চালিত চীনা ধনিকগণ মুসলিমদের ওপর করতো নিপীড়ন আফিংখোর, চোর, ডাকাত, গুণ্ডাদের দ্বারা।

কিন্তু চীনা মুসলমান নীরবে সকল যাতনা সহ্য করতো, কখনও প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হতো না ধর্ম্মের নাম করে। তারা জাপানীদের সঙ্গে করতো অসহযোগ, আর চীনা-গুণ্ডাদের সঙ্গে করতো আপন ভাইয়ের মত ব্যবহার। কালে কালে মুস্‌লিমদের এ সহনশীলতা গুণেই দেশবাসী মুগ্ধ হল, জাতীয়তাবাদীরা তাদের দিল সম্মানের আসন। নান্‌কিন সরকারের ভেদ-নীতি, নির্য্যাতন সকলই বৃথা হলো।

এদিকে খৃষ্টান জেনারেল ফেংকে প্রলুব্ধ করে বিদেশীরা চাইলো তাদের তাঁবেদার করে রাখতে। এজন্যে বিদেশী-পরিচালিত সংবাদপত্রে তাঁর প্রশংসা অবিরাম প্রকাশিত হতে থাকলো। কিন্তু বিদেশীর ধাপ্পায় তিনি পড়লেন না। চীনের উন্নতি বিধানেরই চেষ্টায় নিরত হলেন। আবার সেই উদ্দেশ্যে পিকিন ত্যাগ করে রুশিয়ায় গেলেন সংগঠন-কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করতে। সে দেশ হতে ফিরে এসে দেখলেন চীনের দুর্দ্দশা চরমে উঠেছে। বেগতিক দেখে তিনিও রাজনীতি হতে বিদায় নেন।

সম্প্রতি (১৯৪৯ ফেব্রুয়ারী) আমেরিকা হতে ফেরবার পথে জাহাজ ডুবিতে তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

ডাঃ সান্‌-এর মৃত্যু

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ১৯২৫ খৃঃ অঃ জাপান হতে ক্যাণ্টনে ফিরে আসেন। এবার দেখলেন যে কুওমিন্তাং-বামপন্থীদের সঙ্গে একযোগে কমিউনিষ্ট দল কাজ করছে। দেখে খুশি হলেন।

এ সময়েই জাতীয় জাগরণের কাঠামো হতে শ্রমিক-কৃষকের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠ্‌লো। তারাই এসে যোগ দিল কমিউনিষ্ট দলে।

কিন্তু ও বৎসরই তাঁর মৃত্যু হলো। দেশের কাজে যে আন্তরিকতা তিনি প্রদর্শন করেছেন, যে রাজনৈতিক দুরদৃষ্টির পরিচয় তিনি দিয়েছেন, তা-ই তাঁর স্মৃতিকে গণমনে চির-জাগরূক রাখলো।

মাদকতার প্রতিক্রিয়া

সেনাধ্যক্ষ চু-তে

ইউনান্ পার্ব্বত্য প্রদেশের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম পেয়েও চু-তে পাহাড়ে পাহাড়ে ডান্‌পিটেপনা করেই কাটিয়েছিলেন নিম্ন শ্রেণীর ছেলেদের মত। তাঁদের পরিবারকে আমাদের দেশের ছোট-খাটো জমিদার বলা যেতে পারে। তা হলেও অন্য মধ্যবিত্ত ছেলেমেয়ের মত ফরাসী অধিকৃত তংকিনের হানয় শহরে তিনি যান নাই বিলাসের শফরে। তংকিন্ ইউনানের প্রতিবেশী প্রদেশ।

কিছুটা লেখাপড়া তিনি শিখেছিলেন স্বগ্রামের বিদ্যালয়ে। তারপরই তাঁর কর্ম্মজীবনের আরম্ভ—সরকারী সেনা-বাহিনীতে লেফটানেণ্ট পদে। এখানে পারিবারিক আভিজাত্যই তাঁকে সরাসরি জঙ্গী-অফিসার গোড়া থেকে হতে সহায়তা করে।

এ পল্টনে সেনাদের বিদেশী ধাঁজের ইউনিফর্‌ম, বিদেশী রাইফেল, বিদেশী কায়দায় কুচকাওয়াজ, বিদেশী নিয়মের কড়া ডিসিপ্লিন্। নিয়মতান্ত্রিকতা চু-তে'কে কতকটা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন করে তুল্‌লো। কিন্তু বেশি দিন নয়। তিনি বদ্‌লি হয়ে সিভিল বিভাগে উচ্চ পদে এলেন।

এখানে ছোঁয়াচ লাগলো অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনের। তারপর এল লড়াই। প্রেসিডেণ্ট ইউয়েন সি কাই সম্রাট হয়ে সিংহাসনে বস্‌তে উদ্যত হলেন। চু-তে এরূপ অঘটন সমর্থন করলেন না। তাঁর প্রদেশের শাসনকর্ত্তাদের সহযোগে প্রেসিডেণ্টের সমর্থক-পক্ষকে বাধা দিলেন। যুদ্ধে তাঁদেরই জয় হলো। এই সমর-তাণ্ডব হতেও চু-তে যথেষ্ট অর্থ সংগ্রহ করলেন।

সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত-গোষ্ঠীর ভাড়াটে পর্য্যটকগণ প্রচার করেছেন যে এ সময়ে চু-তে প্রকাণ্ড এক বাড়িতে অনেকগুলা পত্নী ও উপপত্নী নিয়ে বাস করতেন। কিন্তু এটা একদেশদর্শিতা। এ সকল নারী চীনের কৃষি-মজুরদের পরিবারের। ভূমির মালিক এ প্রকার নীতিহীনতাকে চীনে নিয়মে পরিণত করে ফেলেছিল।

প্রতিক্রিয়া

কিন্তু একদিন এল প্রতিক্রিয়া। অনুশোচনা চু-তে'কে অতিষ্ঠ করে তুললো। তিনি আফিং ত্যাগ করতে মনস্থ করেও, কৃতকার্য্য হলেন না। অনুতাপ বেড়ে চললো। এমন দিনে তিনি দেখা পান মঃ তাম্বি নামে এক তামিল ভদ্রলোকের। ভদ্রলোক চীনভাষায় পণ্ডিত, আবার ব্যবসায়ী।

তিনি দিনের পর দিন মার্কস্‌বাদ নিয়ে চু-তে'কে শিষ্যে পরিণত করেন। চীনের কৃষক-মজুরদের শোচনীয় অবস্থা বর্ণনা করে যেদিন মঃ তাম্বি মজুর-নারীদের ওপর যথেচ্ছ ব্যবহারের ইঙ্গিত করলেন, সে দিনই চু-তে নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের অসঙ্গত কার্য্য পরিষ্কার দেখতে পেলেন। তখন তাঁর পক্ষে আফিং কেন, দুনিয়ার সব কিছু, এমন কি প্রাণ পর্য্যন্ত বর্জ্জন করার শক্তি এল।

কয়েকমাস মধ্যেই বাড়ি হতে নারীদের বিদায় করে দিলেন চু-তে। কিছু কিছু জমি তাদের দিয়ে দিলেন খোর-পোষের জন্য।

মঁশিয়ে তাম্বির সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল আমার হানয় শহরে। তিনি আমায় ইউনান ফোঁ যেতে মানা করেছিলেন। সেটা নাকি জনহীন জনপদ। অথচ তিনি সেখানে যাতায়াত করতেন হামেশা। তিনি আরো বলেছিলেন—ক্যাণ্টন এখনও তেতে আছে, বেড়িয়ে দেখার সুবিধে হবে না।

আমি তাই ইউনান ফোঁ না যেয়ে গেলাম হংকং। পরে অবশ্য ক্যাণ্টনে গিয়েছিলাম।

চু-তে'র মনে অনুতাপের তুষানল নির্ব্বাপিত। কাজ আরম্ভ করবার তাঁর আর তর সয় না। কৃষক-মজুরের অবস্থার উন্নতি করতে হবে, দেশ হতে দুর্নীতির বোঝা নিশ্চিহ্ন করতে হবে। ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের ত্রি নীতি তাঁকে এগিয়ে এনেছে—মার্কস্‌বাদ বলে দিচ্ছে মুক্তির পথ।

নতুন দৃষ্টির মায়া-কাজল নিয়ে ইচাং এলেন। ব্রিটিশ জাহাজে করে রওনা হলেন সাংহাইয়ের দিকে। ব্রিটিশ জাহাজে আফিং-এর ব্যবস্থা নাই। আফিং-এর অভাবে শরীর-মন ক্লিষ্ট হলো। কোন দিকে তাঁর ভ্রূক্ষেপ নাই। চীনকে দিতে হবে মুক্তি, চীনবাসীকে দিতে হবে মানুষের জন্মগত অধিকার।

আফিং না খেয়ে ক'দিন কাটাবার পর তিনি দেখলেন আফিং-এর মাদকতা ততক্ষণই দাস করে রাখতে পারে, যতক্ষণ দৃষ্টি থাকে অস্বচ্ছ, কিন্তু একবার

মুক্ত দৃষ্টির স্বাদ পেলে আর কোন মাদকতার প্রয়োজন হয় না, নব ভাবধারাই তার পরিপূর্ণতার আমেজে সদা মশ্‌গুল করে রাখে।

বিদেশ-যাত্রা

চু-তে এবার বিদেশ যাত্রা করলেন।

চীনাদের বেশ বদলাতেও বেগ পেতে হয় না। নেকটাই কলার পরলেই হল। আর নামটা বদলাতেও হিমসিম খেতে হয় না। নতুন নামে পাসপোর্ট হল, জাহাজে উঠে পড়লেন।

কালাপানি পাড়ির কাতরতা ক'দিন ভোগালো। তারপর সব ঠিক হয়ে গেল। স্বল্পাহার আর সাগরের স্নিগ্ধ সমীর তাঁকে সব ভুলিয়ে দিল। জাহাজ বন্দরের পর বন্দর পার হয়ে শেষটায় হামবার্গে নিয়ে তাঁকে পৌঁছে দিল।

প্রকৃত স্বাধীন দেশের লোকের চিন্তাধারা চু-তে'কে চমৎকৃত করলো। আরো বিস্ময় জাগলো, যখন সাধারণ লোকের মুখে যেখানে সেখানে, রাষ্ট্রনীতির জটিল প্রশ্নের আলোচনা শুনলেন। চীনা ক্লাবের সহায়তায় পেলেন উপদেষ্টা। এতদিন যেটা ছিল শুধু মতবাদ, তার সংগঠনের রূপটি কিছুটা ধরা দিল তাঁর কাছে।

কিন্তু আশ মিটলো না। তিনি একদিন চলে গেলেন সোভিয়েট রুশিয়া। রুশিয়ায় প্রবেশ কোনদিনই সুগম নয় বিদেশীর পক্ষে। তবু চীনদেশবাসী বলেই অতিকষ্টে প্রবেশাধিকার পেলেন।

সেখানেও তিনি শিক্ষার্থী। একজন চীনা-ধুরন্ধর তাঁকে দিলেন ব্যবহারিক শিক্ষা। সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও অর্থনৈতিক বিপ্লব কি করে রুশরা দেশ ও দেশবাসীর জীবন-যাত্রার পরিপোষক করে নিয়েছে, সে দিকটাই তিনি পর্য্যবেক্ষণ করলেন সূক্ষ্মভাবে।

তারপর ফিরে এলেন চীনে। চু-তে পল্টনী চাকরি করেছিলেন জেনারেল ফেন সি শেন নামে এক তুতুস্‌-এর অধীনে। তুতুস হলেন সে সব সেনা-নায়ক যাঁরা আপন আপন এলাকায় খাজনা আদায়ের অধিকারী। এ ধরণের তুতুস্‌রাই যোগদান ক'রে ডাঃ সানের সঙ্গে চতুরতা খেলে দ্বিতীয় গণবিপ্লবকে বিফল করেছিল।

১৪০ নং পল্টন

চু-তে দেশে ফিরেছেন খবর পেয়ে জেনারেল তাঁকে ডেকে পাঠালেন। কথাবার্ত্তায় যখন দেখ্লেন চু-তে পল্টনে কাজ করতে নারাজ নন্, তখন তিনি তাঁকে ১৪০ নং রেজিমেণ্টে এক সেনাধ্যক্ষ পদে নিযুক্ত কর্লেন।

চু-তে'র কার্য্যকলাপ আগে তিনি দেখেছেন। এখন বিদেশ ভ্রমণের ফলে তাঁর সংগঠন-শক্তি বেড়েছে নিশ্চয়। তাই জেনারেল ফেন সি শেন তাঁকে হাতে রাখ্লেন, চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে বিরোধ উপস্থিত হলে কাজে লাগাবার জন্য। চিয়াং কাই শেক তখন প্রেসিডেণ্ট হলেও, জেনারেল ফেন সি শেন তাকে দুচোখে দেখতে পারেন না।

চু-তে আবার এ চাকরি সানন্দে গ্রহণ কর্লেন এই ভেবে যে, এই সুযোগে তিনি সেনাদের সোভিয়েট রুশিয়ার আদর্শে নির্লোভ, দুঃসাহসী ও দেশপ্রাণ করে গড়ে তুল্তে পারবেন।

তখনকার দিনে কোন জেনারেল বা দেশ-নেতার জীবনই নিরাপদ ছিল না। গুপ্তচর, দেশদ্রোহী, বিশ্বাস-হন্তা সেকালে চীনের দিকে দিকে ঘরে ঘরে। সেজন্য চু-তে'কে বাধ্য হয়ে নিজেরও গোপন সন্ধানী-দল রাখতে হয়েছিল! তা ছাড়া তিনি নিজেও থাকতেন সব সময়ে হুঁশিয়ার।

সোভিয়েটে শিক্ষাপ্রাপ্ত নতুন পদ্ধতিতে তিনি কাজে লেগে গেলেন। যেমন ইউরোপের নতুন রণ-নীতি তিনি প্রবর্ত্তন করলেন, তেমনি গণতান্ত্রিক আদর্শ সৈন্যগণের অন্তরে ফুটিয়ে তুললেন। জেনারেল তাঁর কাজে খুশি হয়ে তাঁকে সমগ্র রেজিমেণ্টের উপদেষ্টা পদে বরণ করে নিলেন।

চু-তে কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন, একথা চিয়াং কাই শেকের কানে পৌছাতে দেরি হল না। জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই শেক তখন সকলের অগোচরে ১৪০ নং পল্টনে কতকগুলা গুপ্তচরকে সেনাদল ভুক্ত করে রাখেন। এদের ওপর গোপন নির্দ্দেশ রইলো সুযোগ পেলেই চু-তে'কে হত্যা কর্তে। কমিউনিষ্ট দমনকারী বলে তখন চিয়াং কাই শেকের নামে দেশে ঢি-ঢি পড়ে গেছে।

চু-তে'র গোপন-সন্ধানীরা হত্যার ষড়যন্ত্র টের পেয়ে তাঁকে জানিয়ে দিল। তিনিও আত্মরক্ষার জন্য অগোণে এ চাকরি ছেড়ে দিয়ে গেলেন। তাঁর সন্দেহ ছিল জেনারেল ফেন সি শেন্-এর ওপরেও।

কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এ ষড়যন্ত্র তাঁর অগোচরেই সৃষ্টি করা হয়েছিল। আর সে কথাটা চু-তে'কে বুঝিয়ে দেবার জন্য তিনি চু-তে'র নিপুণ সংগঠন কাজের জন্য পঞ্চাশ হাজার রৌপ্য মুদ্রা পুরস্কার দিলেন।

চাকুরি ছেড়ে দিয়ে তাঁর চিন্তা হলো কোন্ পথে কি ভাবে এখন তিনি অগ্রসর হবেন। তিনি দেখ্‌লেন চীনের সর্ব্বত্র অরাজকতা, তুতুস সেনাপতিগণ শোষণ-শাসনে-স্বেচ্ছাচারে রাজতন্ত্রকেও হারিয়ে দিয়েছে।

প্রেসিডেণ্ট ইউয়েন সি কাই কুওমিন্তাংকে বে-আইনী ঘোষণা করলেও যতদিন ডাঃ সান ইয়াং সেন বেঁচেছিলেন, ততদিন তিনি তাঁর গণতন্ত্র-সম্মত কার্য্যধারার বলে কমিউনিষ্টদের কুওমিন্তাং দলে রাখতে পেরেছিলেন। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর হতে চীনের জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে নিদারুণ শেলাঘাত করলো ধনিক শ্রেণী। তারা কুওমিন্তাং-এর ভিতরে থেকেও সকল রকম প্রগতি-বিরোধী কাজই করে যেতে লাগলো। বিপ্লবী ভাবধারা হারিয়ে ফেল্‌লো কুওমিন্তাং। মাদাম সান ইয়াৎ সেন চেষ্টা করেও তাদের মতিগতি ফেরাতে পারলেন না।

তাদের স্বার্থে যেখানে লেগেছে আঘাত, যেখানে তাদের কার্য্য-কলাপের হয়েছে সমালোচনা, হয়েছে প্রতিবাদ, সেখানেই তারা চালিয়েছে গুপ্ত হত্যা। হিংসা-দ্বেষ, বিরোধ কুওমিন্তাং-এর অন্তরকে করেছে কালিমাময়।

১৯১১ খৃঃ অঃ সম্রাটের অপসারণের পর হতে সত্যিকারের গণতন্ত্র-প্রচারিত সরকার গড়ে ওঠে নাই। কুওমিন্তাং-এর ভিতর যারা সমর-কুশল ধুরন্ধর তারা স্ব স্ব প্রধান। নিজ নিজ এলাকায় তারা রাজতন্ত্রের সকল অপকর্ম্মের বিধাতা। সেজন্য লড়াই ও হত্যা হয়েছিল তাদের নিত্য সহচর।

অধ্যাপক লাই সি য়্যা

লাই সি য়্যা নামে একটি কর্ম্মী জার্ম্মানী থেকে শিক্ষা লাভ করে নিজ গাঁয়ে ফিরে আসছেন। জাহাজ থেকে নেমে রেলপথে এলে গ্রাম। চীনা পোষাকে স্যুটকেশ হাতে তিনি কাষ্টম্‌স্ পরীক্ষা বরদাস্ত করে রেলগাড়িতে চাপলেন—কাউলিন হয়ে ক্যাণ্টন যাবার লাইনে।

পাশে বসা মাকাওবাসী চীনা, লাইয়ের ঘাড়ের ওপর দিয়ে ঝুঁকে অপর এক ব্যক্তির সঙ্গে কথা বল্‌তে লাগলো। এরকমের বেয়াদবি কার সহ্য হয়। সদ্য জার্ম্মানী ফেরত লাই প্রতিবাদ জানালেন, 'এটা কি ভদ্রতা?'

লোকটা রুখে উঠ্‌লো—চীনজাতির আবার ভদ্রতা! চারদিক থেকে দুষমনেরা ছেঁকে ধরেছে, পালাবার পথ নাই। সে জাতের আবার সভ্যতার দেমাক। মশায় যাবেন কোথা?

জবাব দিলেই নিজ পরিচয় ফাঁস হয়ে যায়। লাই বুদ্ধিমান, নীরব হয়ে গেলেন। তারপর ট্রেন থামতেই স্যুটকেস হাতে নেমে গ্রামের পথ ধরলেন। গাঁয়ে পা দিতেই পূর্ব্ব পরিচিতদের কারু কারু দেখা পেলেন। তারা দেখালো গ্রামের বড বাড়িটা ধ্বংসস্তূপে পরিণত। বিদ্রোহের সময় সরকারী সৈনিকদের আক্রমণে ভূমিসাৎ।

তারা নিজেদের বিপদের কথাও বল্‌লো। তারপর লাইকে বাড়ি অবধি পৌঁছে দিয়ে গেল। ভিতরে ঢুকেই লাই শুনলেন, দুইজন গ্রাম্য মিলিশিয়া লাইদের বাহির মহলে বসে, তাঁর পিতা ও শ্বশুরকে প্রাণ ভরে গাল দিচ্ছে আর ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের তারিফ কর্‌ছে।

গ্রাম্য মিলিশিয়া ওদের বাড়িতে বসে থাকার কারণ আর কিছুই নয়। লাইয়ের পিতা ও শ্বশুরের জমি আছে, সুদে টাকা খাটাবার ব্যবসাও আছে। তদুপরি ভাল মানুষ বলে খ্যাতিও আছে। তাই গ্রাম্য মিলিশিয়া তাদের হুকুমে পরিচালিত। এটাই সরকারী নিয়ম।

লাই ভিতর বাড়িতে গিয়ে পিতার সঙ্গে দেখা কর্‌লেন। পিতা লাইয়ের বিনা-খবরে আগমনের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। ফিরে আসবার কারণ জানতে চাইলেন।

—জার্ম্মানরা আমাদের ওপর আর খুশি নেই, তাই চলে এলাম।

প্রকৃত কারণ সে বল্‌লে না। পিতা যে রাজতন্ত্রের সমর্থক আর বিপ্লব বিরোধী, তা সে জানে ভাল রকমই।

—তা হোক। তোমায় প্রেসিডেন্টের কাছে নিয়ে গেলেই ভাল চাকুরি মিল্‌বে। সে তো আমার বন্ধু।

রাজতন্ত্রের সমর্থক যারা তারা যে প্রেসিডেন্টের নেক নজরে থাক্‌বে এ আর বেশি কথা কি।

ওদিকে আবার সাম্রাজ্যবাদীরা যেমন কমিউনিষ্টদের নির্ম্মূল করাচ্ছে, দেশীয় সামন্ত-প্রভু আর তুতুসদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করে, তেমনি স্থির করেছে ইউরোপ-আমেরিকা হতে শিক্ষাপ্রাপ্ত কর্ম্মীদেরও কর্‌বে দফা নিকাশ। নইলে চীনে আর সাম্রাজ্যবাদীর সুরাহা নাই।

এ হত্যাকাণ্ড চালাবার জন্য সারা-চীনে চারটি অফিস খোলা হয়েছে 'চায়না ট্রেডিং কোম্পানি' নামে। ক্যান্টনে তার একটি শাখা। কোম্পানির মালিক সবাই বিদেশী, জাপানের শেয়ার মোটা রকমের, বাদ বাকি ইউরোপিয়ান।

লাই কিন্তু প্রেসিডেন্টের কাছেও গেলেন না। ক্যান্টন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোফেসর হলেন। জার্মান ভাষা শিক্ষা দান হলো তাঁর কাজ। কিন্তু এ শিক্ষাদান কালে লাই রাজনীতি থেকে অর্থনীতি পর্য্যন্ত সকল ব্যাপারেই ইউরোপের বিপ্লবী মনোবৃত্তিরই ব্যাখ্যা করতেন!

কাজেই ছাত্রমহলে তাঁর বেশ সুনাম হলো। জাতীয়তাবাদী বলে, কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন বলে ছাত্রসমাজে তাঁর জনপ্রিয়তা বেড়ে চল্‌লো। মাঝে মাঝে ছাত্রেরা তাঁকে আমন্ত্রণ করে ক্যান্টন রেস্তোরাঁয় খাওয়াতো আর ডিনার টেব্‌লে বসে লাই ছাত্রদের ইউরোপের মত ডান্‌পিটে হতে উপদেশ দিতেন।

গুপ্তচরেরা সকল সংবাদ রেখে সাম্রাজ্যবাদী প্রভুদের সঙ্গে পরামর্শ করে একটা গোপন চাল চাল্‌লো।

ক্যান্টন রেস্তোরাঁ সাপের মাংস রান্নার জন্য বিখ্যাত। কোবরা মাংস ছোট ছোট কাপে প্রতিদিন বিক্রি হয়, দাম পাঁচ ফ্রাঙ্ক। অনেকেই সে মাংস খেতো, কারণ চীনাদের বিশ্বাস কোবরা মাংস খুব উপকারী। শ্যামদেশ হতে যে সব বিষধর সাপ চালান আসে সে মাংসের চাহিদা বেশি।

সেদিন ক্যান্টন রেস্তোরাঁয় ছাত্রদের ভোজ, লাই সম্মানিত অতিথি। মেনুতে কোবরা স্যুপ, কোবরা মাংস লেখা আছে অন্য খাবারের সঙ্গে। সবাই মিলে খেতে বসেছে। কোবরা স্যুপ মুখে দিয়েই লাই আর দু পাশের দুটি ছাত্র বেহুঁশ হয়ে চেয়ার থেকে মেঝেয় পড়ে গেলেন। মুখ দিয়ে তাঁদের গাঁজলা উঠতে লাগলো। আধ ঘণ্টার ভিতর তাঁদের মৃত্যু ঘট্‌লো।

পুলিশ ডাকা হল। সরকারী স্বাস্থ্য বিভাগের কেমিষ্ট এল। রেস্তোরাঁর সেদিনকার স্যুপ্‌-এ মাংসে কোন বিষ পাওয়া গেল না। অথচ যে কাপ্‌ থেকে লাই ও দুটি ছাত্র স্যুপ খেয়েছিল, তা একদম খালি তাতে এক ফোঁটাও অবশিষ্ট নাই। সে কাপ তিনটি যেন ধুয়ে পুঁছে রাখা।

সন্দেহ হলেও কাকেও কিছু বলা গেল না। পুলিশ চলে গেল। তারপর ব্যাপারটা পড়লো ধামাচাপা। ছাত্র-মহলের শত চেষ্টাও কর্ত্তৃপক্ষকে কি পুলিশকে অপরাধীর সন্ধানে নামানো গেল না।

সংবাদটা এনেছিল চু-তে'র সন্ধানী দল। চু-তে বুঝ্‌লেন প্রকাশ্যে দেশের কাজ করার যুগ আর নাই। কাজ করতে হবে গোপনে।

চু-তে'র মুক্তি-ফৌজ

জেনারেল ফেন্‌ হতে যে টাকা চু-তে পেয়েছিলেন, তাকে মূলধন করে তিনি নিজস্ব সেনাদল গড়তে আরম্ভ করলেন। বেশি সংখ্যায় সৈন্য তিনি প্রথমটা নিলেন না। যাদের নিলেন তাদেরে তিনি করে তুললেন বিপ্লবী মনোবৃত্তির ধারক। সব চেয়ে তারিফের হলো এই যে, বিপ্লবীরা দেশের মুক্তির বেদীমূলে জীবন সমর্পণ করে বলে অর্থের লালসা থাকে না। অনশনে অর্দ্ধাশনে ছিন্ন বস্ত্রে দিনপাত করতে বাধ্য হলেও করে না দেশবাসীর ওপর জুলুম, অত্যাচার।

কিছু দিনের ভিতরই চু-তে'র মুক্তি ফৌজ হল সর্ব্বংসহ। যে কোন অবস্থার জন্য তারা সদা-প্রস্তুত, ভয়লেশ তাদের নাই, এমন কি মৃত্যু-ভয়ও না। চু-তে তৃপ্ত হলেন, দেখলেন মুক্তিফৌজের এক-একটি বীর-যোদ্ধা বেতনভোগী সেনার দশজনের সমান। কারণ কোন রকম বিপদই তাদের ধৈর্য্যকে, তাদের দুঃসাহসকে ম্লান করতে পারে না।

তখন একদিন তিনি দলের সকল সেনাকে ডেকে সভা বসালেন। দেশের দুর্দ্দশার কথা অনেকদিন তাদের বুঝিয়েছেন, আজ চাইলেন ভাবী কর্ম্ম-পন্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব, পরামর্শ। এখানে বলা দরকার যে সৈন্যরা সবাই শিক্ষিত। তাই জাগ্রত জনমতকে নেতা বলে শিরোধার্য্য করতে চু-তে'র এ প্রয়াস।

বিপ্লবী সেনাদলের প্রতিটি চিন্তাশীল যোদ্ধা অকপটে তাদের অন্তরের আশা— 'কমিউন্‌' স্থাপনের কথাই জানালো। বেতন-লোভী ফৌজ হলে সর্দ্দারের এমন প্রশ্নে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের ইঙ্গিতই বুঝে নিত। কিন্তু মুক্তি-ফৌজ সে ছাঁচে ঢালাই নয়। চু-তে নিজেও খবর পেয়েছিলেন যে, ক্যাণ্টনে 'কমিউন্‌' গড়ে তোলা হয়েছে। তাই তাঁরও লক্ষ্য ছিল সেদিকেই। এমন দলের মত পেয়ে তিনি মনোবাসনা সফল করতে লেগে গেলেন।

স্থান মনোনীত হলো হুনান প্রদেশের পার্ব্বত্য অঞ্চল। অন্য উপায় নাই। এমন স্থানে তাঁদের 'কমিউন্‌' স্থাপনা করা দরকার যেখানে প্রেসিডেণ্ট কিম্বা কোনও তুতুস সেনাপতির কোন রকম প্রভাব না থাকে।

তাই একদিন ডেরাডাণ্ডা গুটিয়ে তাঁর শিক্ষিত অর্দ্ধাহারে-তৃপ্ত সেনাদল নিয়ে তিনি হুনান পার্ব্বত্য ভূমির দিকে রওনা হলেন। পথে কয়েক স্থানে ছাত্রসমাজের সঙ্গে হলো সাক্ষাৎ। তাদের সবার মুখেই ক্যাণ্টন্-এর বিচিত্র কর্ম্মপন্থার প্রশস্তি। তিনি যে ঠিক পথই ধরেছেন তার সমর্থন পেয়ে তৃপ্তিতে তাঁর প্রাণ ভরে গেল।

মাও সে তুন্-মিলন

হুনানের অর্দ্ধপথে চু-তে'র দলের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো অধুনা-বিখ্যাত কমিউনিষ্ট কর্ণধার মাও সে তুন্-এর দলের সঙ্গে। মাও সে তুন্ও বেরিয়ে পড়েছেন হুনান প্রদেশের নিরালা পার্ব্বত্য অঞ্চলের উদ্দেশে। তাঁরও অভিপ্রায় কমিউন স্থাপন।

চু তে নতুন দলটিকে লক্ষ্য করে দেখলেন। মাও সে তুন্-এর দলে রয়েছে কৃষি মজুর ও তাদের পরিবার পরিজন। বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ কৃষকগণের হাতে বন্দুক। বন্দুক যথেষ্ট সংখ্যায় জোগাড় হয় নাই। তাই অবশিষ্টের হাতে বর্শা-বল্লম-তলোয়ার। নেহাৎ অন্য অস্ত্র-শস্ত্র জোটে নাই বলে কারু কারু হাতে রাম-দা, কোঁচ প্রভৃতি। ওদিকে আবার চাষীদের পত্নীগণ শিশু-সন্তান নিয়ে সঙ্গে চলেছে স্বামী পুত্রের।

এরকম অস্ত্র-শস্ত্র সংগ্রহ হতেই লোকগুলার দেশের কাজের জন্য আন্তরিকতা কত তা নিমেষে উপলব্ধি করে চু-তে অভিভূত হয়ে পড়েন।

মাও সে তুন্-এর সঙ্গে দু-চার কথা হতেই চু-তে উল্লাস-ভরে তাঁর দলে যোগ দেন। জহুরীই জহরৎ চেনে। যোগ্যে যোগ্যে হলো মিলন।

গুরুত্বপূর্ণ এ যোগাযোগের নিবিড়তায় গড়ে উঠ্‌লো চালিন সোভিয়েট—যার প্রতিরোধ ক্ষমতায় জাপানের অন্তরাত্মা একদিন কেঁপে উঠেছিল, যার দীর্ঘ হস্ত আজ চুংকিনের পর্ব্বত শিখর হতে জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই শেককে করেছে আশ্রয়-চ্যুত।

চালিন সোভিয়েট

চীন ভ্রমণকালে হুনান প্রদেশ দিয়ে আমি চলেছি হেনচো ফোঁ। সুন্দর পথ। আমায় হঠাৎ পিস্তল হাতে কয়েকজন লোক জোর করে ধরে নিয়ে চললো।

আমি তাদের মনিব্যাগ আগিয়ে দিলাম, তারা নিলে না। আমার কাছে আর কিছু আছে কিনা জান্‌তে চাইলো। কিছুই নেই বলবার পর তাদের সঙ্গে যেতে বললো। ভাল পথটা ছেড়ে যেতে ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু যেতে হলো।

কিছুটা দূর এগুতেই পাহাড়ের গায় তৈরি সিঁড়ি পথ। সে পথে যেতে হবে। নেমে সাইকেল টেনে চল্‌তে হলো। অর্দ্ধেক পথ উঠে আর সাইকেল বইতে পারলাম না। বসে পড়লাম। সঙ্গীরা নাছোড়। আবার জিরিয়ে সিঁড়ি বয়ে উঠতে হলো।

অবশেষে পাহাড় চূড়ায় পেলাম সমতলভূমি। শুনলাম সেখান থেকেই চালিন সোভিয়েট স্বরু। গ্রাম একটা কিছু দূরে। চারিদিকে তুষার—গাছের পাতায় অবধি।

এবারে আমায় সাইকেল চাপতে বলা হলো। দুজন আমার সঙ্গে চললো। বাকি লোকেরা বিদায় নিল। এদের সঙ্গে কথা বলে জানলাম আমায় চালিন গ্রামে নেওয়া হচ্ছে।

দুপুরে ছোট্ট একটা গ্রামে বিশ্রাম। লোকজন বড় কম। কিন্তু পথঘাট ঘরবাড়ি পরিষ্কার, নীরব। কোথাও দুর্গন্ধ নাই। খাওয়া হলো শাকভাজা, ভাত আর মূলো পাতার ঝোল। খেয়ে মাচার ওপর শুয়ে পড়লাম লেপ মুড়ি দিয়ে। বিছানা ধবধবে।

সঙ্গী একটিও শুয়ে পড়লো, অপরটি কি লিখতে বস্‌লো। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আমায় কি করে কি জন্য এখানে আনা হয়েছে তা লেখা হচ্ছে। ওটা ঝুলিয়ে দেওয়া হবে হোটেলটার গায়ে, গ্রামবাসী সকলে পড়বে।

আমায় আনা হয়েছে চালিন সোভিয়েট দেখাতে। অবশ্য এ ভাবে ঘাড়ে ধরে না আন্‌লে আমি আসতাম না চালিনে। কারণ খবরটাই ভাল করে জানা ছিল না। পথ ঘাট তো নয়ই।

বিকালে সঙ্গী নিয়ে বেরোলাম গাঁ দেখতে। একটা প্রকাণ্ড মাঠ, কয়েকটা মৃতদেহ পড়ে আছে। পোষাকে ধনী বলে মনে হলো। সঙ্গী বল্‌লে এরা বিশ্বাসঘাতক, তাই বিচার করে সোভিয়েট দিয়েছে চরম সাজা।

রাতে এলাম রওনা হয়ে একটা প্রকাণ্ড গ্রামে। কিন্তু আলোর অভাব। হোটেলে আশ্রয় নিলাম, পাশে একটা পোষ্ট-এ পতাকা। লাল ঝাণ্ডা। কাস্তে হাতুড়ি তো আছেই আবার মাঝখানে শাদা সূতায় সেলাই করা একটা

সূর্য্যাকার রক্ত-রেখা। বুঝলাম চীনের জাতীয় পতাকার সঙ্গে কমিউনিষ্ট ধারার মিলন।

এখানে এসে মনে হলো নতুন দেশে এসেছি, সেপাই নাই, লোকগুলা যেন বোবা। বেকার, বিলাসিনী, দুর্গন্ধ, শিশু মজুর নাই, দোকানে নাই দর কসাকসি, বাজার চোখে পড়লো না। প্রতি গ্রামেই হোটেল ভরসা, বড় গ্রামে একাধিক হোটেল ও তার পাশে খাবারের দোকান যাকে রেস্তোরাঁ বলা যেতে পারে।

একটা নাইট স্কুল দেখলাম। সবাই লেখাপড়ায় ও কাজে ব্যস্ত। বিদায়কালে সবাই হাত তুলে অভিবাদন করলো।

পরের দিন আর একটা গ্রাম। মিলিটারী স্কুল। শিক্ষার্থীদের যুদ্ধ-বিদ্যার সঙ্গে গঠনমূলক কাজও শেখানো হয়। বিকালে বৃষ্টি হল, তারপর সুতোর মত তুষারপাত। এ আবহাওয়ায় বাইরে যাব না। কিছু খেতে চাইলাম, মেঠাই হলে ভাল হয়।

সঙ্গী বল্‌লে—আপনার চাহিদা লিখিয়ে দিয়ে আসি, এক ঘণ্টা পরে কিছু পাওয়া যাবে। আমাদের সোভিয়েটে ও-জিনিসটির অভাব।

পরের দিন এক কৃষকের বাড়ি দেখলাম। সেই পুরাতন ধরণের বাড়ি, নতুন করে দোর জানালা বসানো। মজুর-বস্তি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, রান্নার পাচক, স্নানের ব্যবস্থা, পরিচ্ছন্ন বিছানা। চীনের কোনো কৃষি-মজুর বস্তিতে এমন ফিটফাট ব্যবস্থা নাই। তারপর যে ছিল আগে ধনী কৃষক, আজ সেও একজন মজুর। মাঠের কাজের পর পালা করেই মজুরেরা ফসল পাহারা দেয়, কৃষকটি না তা চুরি করে বিক্রি করে। লাঙ্গল আধুনিক যন্ত্র—মিস্ত্রি রয়েছে। কৃষক নিজের ভাগের শ্রমের কাজ না কর্‌লে বা কম কর্‌লে অপর মজুরেরা তাকে সে কাজ পূর্ণ কর্‌তে বাধ্য করে।

খেলাম কৃষক-পত্নীর রান্না। মায় অনেক রকম চাট্‌নি। সোভিয়েটে শাক সব্‌জিই বেশি খায়।

চাল্লিন গ্রাম

রওনা হলাম। পথে দেখলাম জাপানের বিরুদ্ধে প্রচার। চিত্র সাহায্যে। চীনের মানচিত্রের ওপর এক চীনা মূর্ত্তি, হাত কাটা। পাশে জাপানীরা দাঁড়িয়ে হাস্‌ছে। একজন জাপানীর হাতে চীনার কাটা-হাত, রক্ত ঝর্‌ছে, তাতে লেখা মাঞ্চুরিয়া। একটা পেট-মোটা জাপানী সে হাতের রক্ত পান কর্‌ছে।

অবশেষে চালিন। আমি নদীর তীরে বসে পড়লাম। সঙ্গীরা গেল আমার সব ব্যবস্থা করতে। তীরে বারো-তের বছরের বালিকা শাক তুলছিল। আমায় দেখে 'কালো ভূত' বলে চেঁচিয়ে পালায় নাই। সোভিয়েটের শিক্ষায় ভয় দূর হয়েছে।

পাকাদাড়ি এক বৃদ্ধ এলেন, সঙ্গীরা ফিরে এল। সঙ্গীদের শেখানো মত বৃদ্ধের সঙ্গে করলাম করমর্দ্দন। বেশ শীত। আমরা উঠে পড়লাম। তারপর গ্রামের রাস্তার ফুটপাথ ধরে চল্‌লাম। ফুটপাথ তো এশিয়ার গ্রামে দেখি নাই, অনেক শহরেই নাই। গ্রামে লোকসংখ্যা প্রচুর, তবু কোনরকম কোলাহল নাই। সর্ব্বত্র শান্তি, তৃপ্তি। মার্কিনের গ্রামের সমতুল্য। ইউরোপের গাঁয়েও ছোটদের ছুটোপাটি গোলযোগ থাকে।

বড় হোটেল, বাইরে থেকে আলোর আমেজ পাওয়া যায় না। ভিতর কিন্তু আলোয় গুলজার। দুটো কক্ষ পার হয়ে ড্রইংরুমে গেলাম। সেখানে হোমরা চোমরা নেতারা বসে ছিলেন। আমি তাদের আর দেখি নাই বা নামও শুনি নাই। তাঁদের একজন জানতে চাইলেন গ্রাম কেমন দেখলাম।

—নতুন অনেক জিনিষ দেখেছি। প্রথম গ্রামের রাস্তায় ফুটপাথ। পথে দেখলাম নতুন ধরণের চায়ের ব্যবস্থা। হোটেল, খাবার দোকান, সবেই বিশেষত্ব। তবে চিনির বোধ হয় অভাব, সেজন্য চায়ে চিনি কম, পিষ্টক-মিষ্টান্নের ব্যবস্থা অপ্রচুর। তবে কোথাও ব্যভিচার নাই।

—ঠিক বলেছেন। তবে মিঠাই প্রচুর তৈরি হবে। আগে সংগঠন ও আত্মরক্ষা।

দোকানঘর হতে খেয়ে এসে টেবিলে রাখা সংবাদপত্র দেখলাম, নানা বিদেশের সংবাদপত্রের ভিতর ভারতের 'এডভান্স'ও রয়েছে।

লোকগুলা বেশ শান্ত, গম্ভীর আর সুসভ্য। বাজে কথা বলে না, নবাগতকে দেখবার অযথা ব্যস্ততা নাই। একজন, মনে হলো, সর্ব্বাধিনায়ক এসে আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন—

—চালিন সোভিয়েটের দীর্ঘায়ুর জন্য আপনি কি করতে পারেন?

—এখানে আমায় খাটিয়ে নিতে পারেন। তার বেশি নয়। নইলে চক্ষু-লজ্জায় আপনার কাছে অনেক কিছু করবার আশ্বাস দিয়ে যেতে পারি, বাইরে গিয়ে কিছুই করলাম না, সেরূপ অসত্য ভাষণ দিব না। কারণ, আমি জানি

আপনাদের হয়ে কিছু প্রচার করতে গেলেই নানকিন সরকার আমায় করবে চীন হতে নিষ্কাশন।

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক অবাক্ হলেন না। আমায় ধন্যবাদ দিলেন সত্যকথার জন্য। পরদিন গ্রাম ঘুরে দেখা হলো। শূকর হাঁস মুরগীর খোঁয়াড় গ্রামের বাইরে। আবৃত ড্রেন দেখে তাক লেগে গেলো। অনাবৃত ড্রেন্ তো বহু শহরেই রয়েছে।

গ্রামের স্কুল। গৃহটি লোকসংখ্যার অনুপাতে মস্ত বড়। সব কিছু শিক্ষা দেওয়া হয়। মিস্ত্রির কাজ, ছুঁতোরের কাজ, চিকিৎসা-তত্ত্ব। অন্যদিকে সাহিত্য, অঙ্ক প্রভৃতি। ক্লাসে বিভক্ত নয়, শুধু কয়েকটি বিভাগ আছে মাত্র। শিক্ষাদান পরীক্ষা পাশের জন্য নয়, জ্ঞান অর্জ্জনের জন্য। স্কুলের সবারই সামরিক পোষাক।

রাস্তায় সঙ্গীটি জানালো, সোভিয়েটে হোটেল-সংখ্যা কম, যেহেতু এ ব্যবসা থেকে মুনাফা করতে দেওয়া হয় না। গ্রামের লোকেরাই পালাক্রমে সব কাজ করে। মনে হলো, অভিনব সংগঠন। বুঝলাম এখানে ব্যবসায়ী কেউ নয়— সবই কর্ম্মী। যেমন অমলিন পোষাক, তেমনি পরিচ্ছন্নতা এদের ঘিরে আছে।

প্রাপ্ত-বয়স্ক সকলেই বিয়ে করেছে। সন্তান-সন্ততির জন্মে সন্ত্রস্ত হয় না কেউ, সোভিয়েট তাদের সকল ভার নেয়। ভারতের দুঃস্থ পরিবারের মত সন্তান অবাঞ্ছিত অবহেলিত নয়।

পাশের গ্রামে গেলাম, লোকের বাস নাই, গোটা গ্রামটাই শস্ত্র-কারখানা। বহুলোক কাজ করছে। অস্ত্রের এক-এক অংশ এক এক গ্রুপে তৈরি হয়। শেষ সব অংশ নিয়ে গিয়ে একস্থানে 'ফিট্' হচ্ছে, অতি কার্য্য-কুশল ফিটার্স রয়েছে। কি দ্রুত তারা কাজ করছে।

—মাইনে কত দেওয়া হয় এদের ?

—অন্ন-বস্ত্র এরা পেত না। থাকতো আস্তাবলের চেয়েও নোংরা ঘরে। এখন পেট ভরে খেতে পায়, পরিষ্কার পোষাক পরে, শোবার ঘর-বিছানা খাসা। এর বেশি এরা আশা করবে কেন ?

ঘুরে ঘুরে দেখলাম কারখানা। এক জায়গায় বারুদ তৈরি করা হচ্ছে। সব রকম হুঁশিয়ারী ব্যবস্থা রয়েছে, আগুন নিভাবার ব্যবস্থা সহ। বাসগৃহ দেখলাম প্রতি শ্রমিকের পৃথক কক্ষ, খাট, টেবিল, চেয়ার, সংবাদপত্র। বিছানা

পরিপাটী। কমন রুমের দেওয়ালে আমার আগমন সংবাদ ও হাতে আঁকা প্রতিকৃতি দেখলাম।

এখানকার দোকান-ঘরে পণ্য সাজানো নাই, খালি। দেখে মনে হয় দোকানটা চালু নয়। কিন্তু মাল আসবামাত্র সব বিক্রি হয়ে যায়, অবিক্রীত পড়ে থাকে না, তাই এদশা। সব জিনিষেরই মাথা পিছু বরাদ্দ আছে। কেউ তার বেশি পাবে না। স্বয়ং মাও সে তুন কিনতে এলেও দৈনিক দশটি সিগারেটের বেশি পাবেন না। চাহিদার তুলনায় উৎপাদন এখানে যথেষ্ট নয় আজও। সোভিয়েটের বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় পণ্য কিনে আনা যায়, তাতে বাধা নাই, কিন্তু পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যাওয়া-আসা কষ্টকর, তার ওপর বিপদ আসতে পারে বিরোধীদের তরফ থেকে।

গণ-নাট্য

চালিনের একটি জিনিষ দেখে আমার তাক লেগে গেছলো, সেটি হলো নতুন ধরণের আমোদ পরিবেশন। সিনেমা সাহায্যে নয়, যাকে আমরা বলি থিয়েটার তারই সাহায্যে।

চীনে যা পুরাতন প্রথার অভিনয় ছিল, তা বৈদেশিকের নিকট শ্রুতি-মধুর একেবারেই নয়। বরং কষ্টদায়ক ঝনৎকার মাত্র। অভিনেতার প্রতি কথার পর পরই বাজানো হয় মস্ত বড একটা কাঁসর। ওরই মধ্যে অভিনেতা যখন ভাব-ঘন অভিব্যক্তি প্রদর্শন করেন, তখন তো যত রাজ্যের ছোট বড় করতাল মন্দিরা থেকে সুরু করে ইয়া বডা কাঁসর পর্য্যন্ত সমগ্র প্রেক্ষাগৃহকে পিতল-কাঁসার পিটাই কারখানায় পরিণত করে। বৈদেশিকদের তখন স্থান ত্যাগ করতে হয়, নয় কানে আঙ্গুল দিয়ে সে প্রলয়-বাদ্য হতে আত্মরক্ষা করতে হয়।

চীনা গায়িকারা যখন গান করে তখনও কোনো বাদ্যযন্ত্র নীরব থাকে না। সবগুলা বাদ্যযন্ত্রকে একত্রে ঘোর নিনাদে ঝঙ্কৃত করে চারিদিক প্রতিধ্বনিত করে তোলা হয়। সে শব্দজাল ভেদ করে গানের পদ ও সুর শ্রোতার কর্ণগোচর করা সহজ কসরতের কাজ নয়। কিন্তু তা বললে কি হয়, গান করতে এসে গায়িকারা কসরতের ভয়ে পেছপা হয় না। নাক-মুখ রক্ত-রাঙা করে, চোখ দুটি ছুটে বেরিয়ে আসবার অবস্থায় তারা উচ্চ হতে উচ্চতর কঁকানো-সুরে তান্ ধরে যেন য্যাম্বুলেন্স ডাকবার চাহিদা আমদানি করে।

চীনাদের নিকট্ এটা আমোদ-প্রমোদ হতে পারে, আমি কিন্তু ও-রকম অভিনয় ও গান হজম করতে পারি নাই। অর্দ্ধপথে রণে ভঙ্গ দিয়েছি আর কোন দিন ফিরে প্রবেশ করি নাই চীনা অভিনয়ে। তাই আমার চালিন-এর গাইড্ যখন আমায় সন্ধ্যায় থিয়েটারে যেতে অনুরোধ জানালো, আমি বলেছিলাম—নিজের কান দু হাতে মলে,

—তার চেয়ে একটা লাঠি এনে আমার পিঠে আচ্ছা করে দু ঘা বসিয়ে দাও।

গাইড্ হেসে উঠে জানালো—সেকেলে অভিনয় নয়, গণনাট্য।

তখন আমার কৌতূহল হলো। গণনাট্য সম্বন্ধে সংবাদপত্রে কিছুটা পড়েছি, কিন্তু দেখার সৌভাগ্য হয় নাই। গেলাম সঙ্গীর সঙ্গে।

একটি বৌদ্ধ-মঠ। বুদ্ধদেবের মূর্ত্তিটিকে এক কোণে নিয়ে পর্দ্দা-ঢাকা করে রাখা হয়েছে। আর যে সব বিকট মূর্ত্তি ছিল, সেগুলা ভেঙ্গে খোয়া করে রাস্তার কাজে ব্যবহার হয়েছে। বুদ্ধ মূর্ত্তি যেখানে ছিল, সেখানেই হয়েছে ষ্টেজ বেশ বড়-সড। বুদ্ধ মূর্ত্তিটি আড়াল করা, কিন্তু তার পাদ-নিম্নের প্রস্তরে এখনো লেখা রয়েছে—'জ্ঞানী হবার চেষ্টা কর'।

বহু দর্শক এসেছে। মনে হলো আশ পাশের গ্রামগুলার নরনারী। যথাসময়ে যবনিকা সরে গেল। ঘন-ঘটা নাই, কালব্যাজ নাই। মুখপাতে একটি গান হলো—সঙ্গৎ ছিল একটি মাত্র সারেঙ্গের সুর। পুরাতন বাদ্যযন্ত্র বর্জ্জিত হয়েছে, পুরাতন ককানো-সুরও আর নাই। কতকটা কোরিয়ান সুরের সমাবেশ। জাপানেও কোরিয়ার সুরই নিজস্ব করে নেওয়া হয়েছে দেখেছি।

আরম্ভের গান হলো শেষ। এবার থিয়েটার অভিনয়।—

চাষী ছেলেমেয়ে স্ত্রী নিয়ে পথে চলেছে। তারা শ্রান্ত-ক্লান্ত। হঠাৎ কোথা থেকে ছুটে এলো একদল সরকারী সেনা। চাষীকে জোর করে ধরে নিয়ে পল্টনী পোষাক পরিয়ে সেনাদলে ভর্ত্তি করলো। এখন চাষীর অসহায় পুত্র-কন্যা আর স্ত্রীর দশা কি হলো তাই গণ-নাট্যের বিষয়-বস্তু।

কত দুঃখ-দুর্দ্দশার পর, ভিক্ষাবৃত্তি, অত্যাচারের পর পেল তারা আশ্রয় চালিন-সোভিয়েটে। তবে সেটা আমাদের দেশের মত অনাথাশ্রমে নয়। তারা পেল কাজ—যার যার শক্তি অনুযায়ী। শিশুরা পেল শিক্ষালাভ।

কাজ যা পেল তার বিনিময়ে বেতন নয় যে নিজের সংসার পেতে বসলো। নিজের সংসার নয়, অথচ অভাব তাদের কিছুই রইলো না। সোভিয়েটের

'ধর্ম্মগোলা' হতে পেত, সকল সোভিয়েট-বাসী কর্ম্মী যে হারে পায়, সব রকম প্রয়োজনীয় জিনিষ—অন্ন, বস্ত্র। এমন অবস্থায় অর্দ্ধাহারে ক্লিষ্ট, শোষণ-পীড়িত চীনের জনসাধারণ যে একটা আশার আলো দেখতে পাবে তাদের অন্ধকার জীবনে, এ বিষয়ে সন্দেহ লেশ নাই।

কাজেই দর্শকেরা হর্ষে-শোকে উদ্বেল হৃদয়ে নির্ব্বাক নীরবে অভিনয় দেখে-শুনে তৃপ্ত হলো—আমাদের দেশের মত 'এন্‌কোর্' 'ব্র্যাভো' প্রভৃতি সোল্লাস তারিফে বা হাততালির কলরোলে অভিনয়কে রসভঙ্গ দ্বারা বাধা দেয় নাই।

চীনে সেই প্রথম রাজনৈতিক আন্দোলন সৃষ্টির পর অহরহই চলেছিল হত্যা, সহসা চিরতরে নিখোঁজ হওয়া, আর বাস্তুত্যাগীর শোচনীয় দুর্দ্দশা। এরূপভাবে আপন জনের বিয়োগে কাতর, গৃহহারা, নিরাশ্রয়ের মর্ম্মবেদনায় সান্ত্বনা কিছু ছিল না। এদের মনের ভার লাঘব করতে না পার্‌লে, এদের কর্ম্মঠ করা যায় না। সে উদ্দেশ্যেই প্রধানতঃ গণ-নাট্যের প্রচলন হয় সোভিয়েট চীনে। রুশ-সোভিয়েটের মত উন্নত ধরণের সিনেমা, নাটক করা সম্ভব হয় নাই অর্থ ও সুযোগের অভাবে।

তবু অভিনয়ের ভিতরে ও-রকম আপনজনের বিয়োগ দেখে সমবেদনায় ভুক্তভোগীর অন্তর ভরে যায়। দুঃখের সমভাগী দুর্গতদের দেখে দর্শকদের নিজের দুঃখ তীব্রতা হারায়—তাদের নয়নে দেখা দেয় না সহায়হীনের হুতাশের অশ্রু—বরং উদয় হয় রোষ-বহ্নি এরূপ নিপীড়নের প্রতিকারের জন্য।

তা হলেই বুঝ্‌তে পারা যায় চীন সোভিয়েটের প্রচার-কার্য্যও সার্থক হয়ে উঠেছে গণ-নাট্য মারফত। এত দুঃখ-দুর্দ্দশায় পিষ্ট হয়েও জনগণ দমে যায় নাই, বিপ্লব-বিদ্রোহের পক্ষপাতীই হয়েছে।

প্রচার-কার্য্য, সহানুভূতির উদ্রেক, বিপ্লবকে আদর্শে প্রতিপন্ন করা ছাড়াও আমোদ-প্রমোদের ভিতর দিয়ে শান্তি দানও সোভিয়েট-কর্ত্তৃপক্ষের লক্ষ্য ছিল। কারণ কর্ম্মীদিগের অন্য কোন সুযোগ ছিল না আনন্দ-লাভের। আর কোনো না কোনো রকম আমোদ ভিন্ন, তরল আনন্দ ভিন্ন মানুষ স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে বিরাজ কর্‌তে পারে না।

ধর্ম্ম ত্যাগ

গ্রামের বৃদ্ধ চেয়ারম্যান অনেক কথা বলেছিলেন। তিনি যাচাই করে নিলেন ধর্ম্মকে নির্ব্বাসন দেওয়া ঠিক হয়েছে কিনা। আমার জবাব—

শুনেছি স্থং বংশ ধর্ম্ম বদলেছে, মাও সে তুন ধর্ম্ম ত্যাগ করেছেন, মা চান্দ সান ইসলাম বর্জ্জন করেছেন। তবু লোকে তো এদের শ্রদ্ধাই করে থাকে।

বুড়ো তাড়াতাড়ি সে সব কথা চীনা ভাষায় লিখে তলায় আমায় দিয়ে স্বাক্ষর করিয়ে নিলেন। সোভিয়েটবাসীদের দেখাবেন তৃতীয় পক্ষ কি বলে। পরে জেনেছি বৃদ্ধও গ্রাম থেকে মিশনারী তাড়িয়েছেন, চীনা লামাদের বিদায় করেছেন। দেবতা-পূজা ও মাদক দ্রব্য দূর হয়েছে।

সোভিয়েটে ডিক্টেটর থেকে বিশেষ বিশেষ ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী সবই গ্রামবাসী-দ্বারা নির্ব্বাচিত। একটু ত্রুটি পেলেই অমনি পুনর্নির্ব্বাচন। তাতে আমাদের দেশের মন্ত্রী প্রভৃতির মত নির্দ্দিষ্ট কাল বহাল থাকবার বাধ্যবাধকতা নাই। অথচ সোভিয়েট-কর্ম্মীর এ খাটুনি অতিরিক্ত—তার নিজস্ব অংশের শ্রমের কাজের ওপরে। সোভিয়েটে নেতা জাগ্রত জনমত।

বাহিরের জুলুম

চালিন গ্রাম ত্যাগ করে সোভিয়েটের পূব সীমানার দিকে রওনা হলাম। সঙ্গীরা রয়েছে। পূবদিকের গ্রামগুলায় গঠন এখনো চল্‌ছে, রীতিমত কাজ চালু হয় নাই। লোকের অভাবও কিছুটা। বাইরের ব্যবসায়ীরাও মাঝে মাঝে আনাগোনা করে এখানকার সস্তা মাল নিয়ে বেশি মুনাফা ওঠাবার জন্য। আবার উত্তর হতে আগত পুরাতনপন্থী ধনিকের রক্ষিসেনাও (ইরেগুলার) এখানে উৎপাত করে।

একটা রেস্তোরাঁয় খেতে গেলাম। পরিচয় দিয়ে তবে খাবার পাওয়া গেল। পরে একদল লোক এল। ম্যানেজার তাদের চলে যেতে বল্‌লো। তারা রুখে উঠে লুকায়িত অস্ত্র-শস্ত্র বের কর্‌লো। সহসা ঘরের ভিতর হতে পল্টন বেরুলো, গুলী চালালো, কয়েকজন নিহত হলো, বাকি পালালো।

ম্যানেজার বল্‌লে—আমাদের উৎপাদন যথেষ্ট নয়, বাইরের লোক এসে জুলুম করলে, তা দমন করতে হবে, নইলে আমাদের রক্ষা কোথায়।

এদিকে পথ-ঘাট নাই বল্‌লেই চলে। সাইকেল রইলো রেস্তোরাঁয়, আমরা এগিয়ে গেলাম।

সঙ্গীদের সঙ্গে কথায় অনেক বিষয় জান্‌তে পেলাম। মাওয়ের মত কর্ম্মবীর চীনদেশে আর দেখা যায় না। সোভিয়েট গঠনের কঠোর শ্রমে তাঁর শরীর দু'বার

ভেঙ্গে পড়ে, তবু দমে যান নাই। দেশে সবাই স্ব স্ব প্রধান, বিদেশীরা যা খুশি করছে, এর ভিতর চীনে কমিউন গড়া মাও সে তুনের পক্ষেই সম্ভব।

কিন্তু এ কর্ম্মবীরকেও কমিউনিষ্ট দল ত্যাগ করতে হয়েছিল। মাও ছিলেন অতি উগ্রপন্থী, বিদ্রোহ তাঁর মজ্জাগত। সে বিদ্রোহের ফলে বহুলোক প্রাণ হারিয়েছিল, বহু নগর-গ্রাম শ্মশান হয়েছিল। তিনি কৃষক মজুরদের ভিতর বিদ্রোহ উপজীব্য করে তুলেছিলেন। কেন্দ্রীয় কমিউনিষ্ট দল অনুমোদন করে নাই। ফলে মাওকে সরে আসতে হয়।

তবু এ বিদ্রোহের ফলেই চালিন-এ সোভিয়েট গঠিত হতে পেরেছে। আমার মনে পড়লো চু তে আর মাওয়ের মিলনের কথাটা। কিছুদিন পরে অন্যত্র একটি ধনিকের (নাম উ) দেখা পাই। তিনি মাওকে ডাকাতের সর্দ্দার বলে গালিগালাজ করেন। আবার লণ্ডনে সে ভদ্রলোকের দেখা পাই। তখন তাঁর মত বদলে গেছে। জান্‌তে চাইলেন, চু-তে, মাও—এরা ধরা পড়েন নাই তো! পঞ্চাশ হাজার চীনা ডলার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে তাদের ধরবার জন্য।

তেমন কিছু বলি নাই। চীনে থাকতে উ শ্রেণী-সঙ্ঘাতের ভয়ে কাতর হয়েছিলেন, এখন ব্যাঙ্ক ব্যালান্স সমেত লণ্ডনে পালিয়ে এসে ডাকাতের ভয় কেটে গেছে। এদের মতামতের মূল্য কি?

শেষ সীমা

পার্ব্বত্য পথ ধরে অনেকটা এগিয়ে সঙ্গীরা বল্‌লে—ওই যে দেখছো লম্বা পাহাড়টা ওটার ও পিঠে আছে প্রকাণ্ড হ্রদ। তার তীরে নানচাং শহর, ক্যাণ্টনের মত বড়। তার আশপাশে সোভিয়েট-কেন্দ্র গড়া হবে। তখন আমরা সেখানে হবো কর্ম্মী।

পাহাড়ে রাস্তায় এঁকে বেঁকে অতি সন্তর্পণে গিয়ে একটা গ্রাম পেলাম। তখন ক্ষুধার উদ্রেক হয়েছে। কিন্তু গ্রামে মানুষ নাই। লোক কোন কোন বাড়িতে আছে দোর বন্ধ করে। শত হাঁক-ডাকেও সাড়া দিল না। রেস্তোরাঁয় খাবার সাজানো, বিক্রেতা নাই। হোটেলে সবই রয়েছে, নেই শুধু মানুষের নামগন্ধ।

খাবার দোকানে গিয়ে নিজেরাই খাবার নিয়ে খেলাম। শেষে এল দোকানদার। বল্‌লে, ডাকাতরা তছনছ করে গেছে গোটা গাঁ। তাই পালিয়েছিল। তাকে

পয়সা দিয়ে রাস্তায় এলাম। দু-একজন লোক দেখা গেল। ডাকাত কারা সে কথায় কেউ কিছু বলে নাই। বল্‌বে কেন? প্রশ্নকারীর মত ও পথ না-জেনে কিছু বলাও বিপদ।

ডাকাত কারা শুনলাম সঙ্গীদের কাছে, গাঁয়ের বড়লোকেরা ছোটলোক কমিউনিষ্টদের আস্কারা দিতে পারে না, করেছিল সোভিয়েটের সঙ্গে লড়াই। নইলে তাদের শোষণ বজায় থাকে না, মজুরকে বেগার খাটাতে পারে না, তিন পয়সার জিনিষ এক পয়সায় পায় না। কিন্তু আজ ছোটলোক-দলই সঙ্ঘবদ্ধ, শক্তিমান। তাই বড়লোক পালিয়েছে। কিন্তু গুণ্ডা-বদমায়েসদের ভাড়া করে পাঠায় ছোটলোকদের জব্দ কর্‌তে।

বিকাল বেলা পেলাম শহর। এখানে সোভিয়েট স্থাপন হয় নি। সঙ্গীদের পক্ষে এমন শহর নিরাপদ নয়। তারাও পর্য্যটক সেজে চল্‌তে রাজি নয়। ফিরতে হলো।

লাল ঝাণ্ডার জনপ্রিয়তা দেখে মনে হয়েছিল, একবার যখন জনগণ পেয়েছে পথ-নির্দ্দেশ, শত নিপীড়নেও এদের আদর্শ ভ্রষ্ট করতে পারবে না।

তবু একথা অস্বীকার করবার উপায় নাই যে চালিনের চাষী-মজুর-শ্রেণী এখনও অনগ্রসর, অশিক্ষিত, কুসংস্কারাপন্ন। প্রকৃত জীবন-পথে তারা মাত্র এক পা বাড়িয়েছে। এতকাল ছিল ক্রীতদাসের অধম, ক্ষুধার্ত্ত, রিক্ত, ঋণদায়ে আকণ্ঠ নিমজ্জিত, জমিদারের হস্তে প্রহার-জর্জ্জর। আজ সে মুক্ত। সে আজ মানুষ। সে আজ জমির মালিক, সামন্ত-তন্ত্র ধ্বংস-প্রাপ্ত।

আর চীন দেশে চাষী-মজুর-শ্রেণী সমুদয়ের পাঁচ ভাগের চার ভাগ।

সবার ওপরে আমার কাছে বিচিত্র লাগলো প্রত্যেক শিক্ষিত চালিন-কর্ম্মীর উত্তর, যখন আমি জিজ্ঞাসা করেছি—চীন দেশের সর্ব্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন কি?

সকলেই একবাক্যে বলেছে—চাষী ও মজুরের জীবন ধারার উন্নতি।

অবুঝ-সবুজের সজীবতা

ছাত্র-আন্দোলন

দেশের প্রগতি ও বিপ্লবের কণ্টকিত পথে ছাত্রসমাজই হয়ে থাকে অগ্রণী। চীনেও এ নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

প্রথম যখন দেশে সহসা দেখতে পাওয়া গেল নবমপন্থী সংস্কারকামী দল মিশনারী ও উদার শ্বেত-সমর্থকদের আওতায়, সেকালে চীনের ছাত্রসংখ্যা ছিল নগণ্য। শিক্ষালাভের সুবিধা-সুযোগ ছিল না শ্বেতকায়দের শিক্ষকতা ভিন্ন। কাজেই ধর্ম্মপ্রাণ চীনের অনেক পরিবারের ছেলেই খৃষ্টানী সে বেষ্টনী পছন্দ করে নাই। বিদেশে গিয়ে শিক্ষালাভ তো ছিল প্রায় অসম্ভব।

ক্রমে অবস্থার উন্নতি হলো। সহ-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত হলো। নেহাৎ পেটের দায়েই দরিদ্র-সমাজ হতে নারীর লৌহ-পাদুকা লুপ্ত হয়ে রইলো অভিজাতদের ঘিরে। ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা বাড়তে লাগলো। ইউরোপে যেয়ে শিক্ষালাভ রেওয়াজ দাঁড়ালো। ছাত্র-সমাজের দৃষ্টিপ্রসার ঘটলো। এর পূর্ব্বে বিদেশী ভাষা শিক্ষা করাও নিন্দনীয় ছিল।

তাই সাংহাই ধর্ম্মঘটে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী প্রথমবারের মত ব্যাপক ছাত্র-বিক্ষোভ দেখে স্তম্ভিত হলো। শেষ বারের পিকিন্ ধর্ম্মঘটে মজুর-বেশী ছাত্র নিহত দেখে শঙ্কা গনলো।

তারপর এল দেশীয় ধনিক শ্রেণী, কল-কারখানার মালিক রূপে, নিঃস্বের নতুন শোষকরূপে। সঙ্গে সঙ্গে উদ্ভব হলো বিদ্রোহী মনোবৃত্তিসম্পন্ন রাজনীতিক দল ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের পরিকল্পনায়। পুরাতন ছাত্র-সমাজের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করলো। গোড়ায় তারা ডাঃ সানের বিরোধী হলেও ক্রমে নিজেদের খাপ খাইয়ে নিল সময়ের গতির সঙ্গে।

নতুন ছাত্র-সমাজ

নতুন যে ছাত্র সমাজ সে আলোড়নের বিষম আঘাত কাটিয়ে উত্থিত হলো, তারা সে-যুগের কোন নিপীড়িত দেশের ছাত্র-সমাজ হতে পশ্চাৎপদ রইলো না। তারাই এসে যোগ দিল ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের বিদ্রোহের সঙ্গে সুর মিলিয়ে।

আজ চীনে দেখতে পাওয়া যায় ধনী হোক গরীব হোক, দাসী বা পতিতা-সন্তান হোক, চীনে জন্মগ্রহণ করলেই তাকে কিছু লেখাপড়া শিখতেই হয়। কাজেই চীনা কিশোর-কিশোরী মাত্রেই ছাত্র-ছাত্রী। সংখ্যা গণনা করলে দেখা যাবে সমগ্র জাতির অর্দ্ধই ছাত্র-সমাজ।

এ ছাত্র-সমাজের আবার উদ্ভব হলো পল্লীতেই বেশি। কিন্তু এতগুলো তরুণ-তরুণীর জীবিকা অর্জ্জনের পক্ষে পল্লী নিতান্তই সঙ্কীর্ণস্থান। তাই এদের দিন দিন ছড়িয়ে পড়তে হয়েছে সারা প্রদেশে। কতক গেছে উচ্চ শিক্ষায়। অবশিষ্ট প্রধানতঃ বিদেশীর কল-কারখানায় মজুরী করতে বাধ্য হয়।

কুলির জীবন গতানুগতিক, তাতে শিক্ষাও তাদের সামান্য, তারা শোষিত হতে থাকে। তখন উচ্চশিক্ষিত ছাত্রগণ বিপ্লবী ভাবধারা প্রচারের জন্যই এসে মজুরদের সহকর্ম্মী হয়। কৃষি মজুরদের ভিতরও এই প্রকারে নতুন রক্ত অনুপ্রবিষ্ট হয়। ফলে যেখানেই ধর্ম্মঘট, যেখানেই গণ বিপ্লব, সেখানেই অন্তরে অন্তরে ফল্গুধারা হলো ছাত্র-ছাত্রী।

এ রূপটি অনেক দিন পর্য্যন্ত বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী ও স্বদেশী পুঁজিপতিদের দৃষ্টির অন্তরালে ছিল। যখনই এ সত্য আবিষ্কার হলো তখনই তাদের ওপর বর্ষিত হলো চরম নির্য্যাতন দস্যু আখ্যা দিয়ে। পরে অবশ্য এরূপ ছাত্র-কর্ম্মীকে কমিউনিষ্ট নাম দিয়ে করা হয়েছে হত্যা।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের সংস্পর্শে এসে ছাত্রসমাজ বিদেশী তিনটি ভাষা—ইংলিশ ফরাসী ও জার্ম্মান শিক্ষা করে আর ও-সকল ভাষার প্রগতি-সাহিত্যে ব্যুৎপন্ন হয়ে ওঠে। আগেই বলা হয়েছে জেমস, ডিউই, মিল, লিঙ্কন প্রভৃতি এবং রুশ সাহিত্য ছাত্রদের উদারনীতি ও বিপ্লবী মননশীলতা দান করেছে।

কিন্তু সর্ব্বোপরি বলতে হবে চীনা ছাত্রের অধ্যবসায় ও সহনশীলতা। বছরের পর বছর নিষ্ঠুর অত্যাচার বরদাস্ত করেও তারা আবার গোপনে গণশিক্ষায়, গণ-জাগরণে ব্রতী হয়েছে জীবনের ভয় তুচ্ছ করে। এমন অধ্যবসায় ও সহিষ্ণুতা ছিল বলেই তারা পেরেছিল আহ্বান-মাত্র শ্রমিকদলকে, জনগণকে বিপ্লবে-বিদ্রোহে লিপ্ত করতে।

সাংহাইয়ের ছয় লক্ষ মজুর একবাক্যে এসে দাঁড়িয়েছিল (১৯২৫) বিদ্রোহের পুরোভাগে শুধু শ্রমিকরূপী ছাত্রভ্রাতা-ভগ্নীদের প্ররোচনায়। ১৯২৬ খৃঃ অঃ

পিকিন্ ধর্ম্মঘটে ছাত্রেরা দিয়েছিল গোপন সাহায্য। হয়েছিল নির্য্যাতিত, হয়েছিল নিহত, তাতেও ছাত্রদের আদর্শ-চ্যুত করতে পারে নাই।

মাঞ্চুরিয়ার শাসনকর্ত্তা মার্শাল চেন স্থ লিন্ সম্রাটের সিংহাসন ত্যাগের পর থেকেই নিরত ছিল অবাঞ্ছিত ছাত্র নেতা-নেত্রীকে দমন করতে। সে ইস্তাহার-জারি করেছিল বিপ্লবে যোগ দিলে প্রাণদণ্ডের। সাধারণ লোক অবশ্য তা মেনে চল্‌তো, কিন্তু ছাত্র-সম্প্রদায় বেপরোয়া। তাদের কার্য্যকলাপ চললো সঙ্গোপনে।

ধূর্ত্ত চেন স্থ লিন্‌ই তলে তলে প্রেসিডেণ্ট ইউয়েন সি কাইয়ের সম্রাট হবার প্রয়াসে করে সহায়তা। তার কাছে জননেতা উ পে ফু পরাজিত, ডাঃ সান্-এর কর্ম্মসূচীর অপহ্নব, ডাঃ সান্ ব্যর্থ। অথচ এমন লোক নাই বিশ্বাসঘাতককে করে শায়েস্তা। তাই যখন জপানী বোমা তার প্রাণ হরণ করে কেউ করে নাই আক্ষেপ, তা বলে জাপানীকেও করে নাই ক্ষমা।

ছাত্র-বেষ্টনী

ডাঃ সান এর দ্বিতীয় গণ-বিপ্লবে সঙ্গী হয়েছিল ছাত্র-সম্প্রদায়। দেশে জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রের অভাব। ছাত্রেরা অভিনব উপায়ে সে অভাব পূরণ করলো। গোপন ছাত্র-বেষ্টনী গঠন করে তারাই হলো একাধারে ছাপাখানা, প্রকাশক, ডাকপিয়ন। বেষ্টনী অফিস হতে ষ্টাইলো করে বেরুতো সংবাদ বুলেটিন দশ-পনরখানা। তার একখানা যে ছাত্রের হাতে পড়তো সে-ই নতুন পাঁচখানা হাতে লিখে বিলি করতো। তা আবার যাদের হাতে পৌছাতো তারাও অনুরূপ লিখে বিলি করতো। এমনি করে অল্প সময়ে ছাত্রগণের শ্রমে হাজার হাজার বুলেটিন্ ছড়িয়ে পড়তো।

বেষ্টনীর ছাত্রেরা মাসিক তিন ডলার করে সাহায্য পেত কুওমিন্তাং হতে। তাতেই তাদের চলে যেত। তবে আস্তানা ছিল তাদের বিনা-ভাড়ায় হোটেলে বা বন্ধুবান্ধবের বাড়িতে। বেষ্টনীর ছাত্রের ভিতর ছিল দুইটি বিভাগ। এক বিভাগে চল্‌তো প্রগতি সাহিত্য পাঠ। অপর বিভাগে কার্য্য পরিচালনা। তবে অবসর সময়ে তারাও শিখে নিত পাঠ-নিরতদের মুখে শুনে শুনে।

উদ্দেশ্য তাদের জ্ঞানার্জ্জন, চাকরি নয়। চাকরি বিশেষ করে সরকারী চাকরি হলো ধনিক-পুত্রদের একচেটে মহাল। শোষক-গোষ্ঠীর মুরুব্বিয়ানার ক্ষেত্র।

পাঠ-নিরত ছাত্রও অনেক সময় পাঠ বন্ধ করে কাজে হাত দিতে বাধ্য হত। কখনো এক বছর দু-বছর কাজ করার পর আবার এসে পাঠে মনঃ-সংযোগ করতো। এমন অধ্যবসায় জগতে বিরল।

শিক্ষা-জীবনে লক্ষ্য

মাও সে তুন ছাত্র জীবনে যখন প্রয়োজনীয় টাকা চেয়ে তাঁর পিতাকে চিঠি লিখতেন তখন কি উদ্দেশ্যে তা দরকার লিখে জানাতে হতো না, জানাতে হতো যে শিক্ষায় এই টাকা খরচ হবে সে শিক্ষা সাহায্যে কর্ম্মজীবনে কত টাকা তাঁর পক্ষে অর্জ্জন করা সম্ভব হবে। অথচ মাও এক পয়সাও অপব্যয় করতেন না; আর তাঁর পিতা ভালোভাবেই জানতেন যে বড় সরকারী চাকৃরি তাঁদের মত পরিবারের আয়ত্তের বাইরে। জীবন প্রভাত থেকেই মাও তাই বিদ্যাকে অর্থকরী হিসাবে গ্রহণ করেন নাই।

আর মহামান্য চিয়াং কাইশেকের ছাত্র-জীবনে দেখা যায় ছোট বয়স হতেই তাঁর শিক্ষার উদ্দেশ্য অর্থার্জ্জন। তিনি এ লক্ষ্যই হৃদয়ে পোষণ করতেন যে, সমগ্র চীনে যত যত ব্যাঙ্ক আছে, তার হতে হবে একচেটে মালিক। সে লক্ষ্যে পৌছাবার জন্য তিনি তাঁর জীবনের প্রতিটি কার্য্য অতি নিপুণতার সঙ্গে ওই এক পথেই চালিত করেছেন। লোভাতুর অর্থ লালসাই তাঁকে তাঁর সকল সদ্‌গুণের সঙ্গে ঘটিয়েছে বিচ্ছেদ।

আর মাও সে তুনের নির্লোভ ত্যাগ-ব্রত ছাত্র-জীবন হতেই তাঁকে ধাপে-ধাপে তুলে নিয়েছে গণ-নেতার মহনীয় আসনে।

অন্তরালে

ধর্ম্মঘটে প্রাণহানি, চেন সু লিন্ এবং সরকারী কর্ম্মচারীদের দমন-নীতি, সাম্রাজ্যবাদীদের ষড়যন্ত্র, দেশীয় ধনিকদের গোয়েন্দাগিরি—নানা কারণে ছাত্র-আন্দোলনের গতিভঙ্গি একেবারে চালিত হলো সকলের দৃষ্টির অন্তরালে।

লি তা চাও-য়ের হত্যা, অধ্যাপক লাইকে বিষ দ্বারা নিধন করণ, অগণিত কর্ম্মীর সহসা নিরুদ্দেশ হওয়া—মূলে যে একটি যন্ত্রই কাজ করছে, তা বুঝে নিতে ছাত্র-মহলের বেগ পেতে হয় নাই আদপেই। তার ওপর তারা বিশেষ খবর

রাখতো কি করে ডাঃ সানের মত মহাপ্রাণ দেশ-হিতৈষীকেও দেশদ্রোহী লণ্ডন-প্রবাসী চীনারা বন্ধুর বেশে ষড়যন্ত্র করেছিল জীবনান্ত করতে।

ডাঃ সান সে সময়ে লণ্ডন মিউজিয়াম লাইব্রেরীতেই পড়াশুনা করতেন দিনের বেশিভাগ। আর সদ্য-রচিত ত্রি-নীতি নিয়েও চীনা-বন্ধুদের সঙ্গে আলোচনা করতেন সন্ধ্যায়-রাতে। অনেক প্রবাসী-চীনাই যাতায়াত করতো তাঁর বাসভবনে। তিনি কোনদিন কোন চীনাকে সন্দেহের চোখে দেখেন নাই।

তাই দুটি পরিচিত চীনা তাঁকে যখন ডিনারের নিমন্ত্রণ জানালো, তখন অসম্মতি জানাবার কোন হেতুই তিনি দেখতে পান নাই। কিন্তু নির্দ্ধারিত সন্ধ্যায় চীনাদের গৃহে পৌছার পর দেখ্‌তে পেলেন নিমন্ত্রণকারীরা অনুপস্থিত। তিনি কি করবেন ভাব্‌ছেন, তখনই কয়েকটা লোক এসে তাঁর ঘাড়ে পড়ে। তাঁকে জোর করে নিয়ে একটা আঁধার ঘরে আটক করে রাখে।

জীবনে এই তার প্রথম বিপৎপাত। কিছুক্ষণ স্তব্ধ থাকার পর মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন। আঁধারে কিছু দেখতে পেলেন না। পরদিন তাঁকে যখন আহার দিতে দোর খোলা হল, একটু আলো প্রবেশ করলো, তিনি দেখলেন উঁচুতে একটা ছোট্ট জানালা আছে। অতি কষ্টে তার একটা খড়খড়ির পাখি একটু ফাঁক করে ফেল্‌লেন, এবার বাহিরের সঙ্গে সংযোগ সম্ভব হতে পারে।

কাগজে সংক্ষেপে বৃত্তান্ত লিখে একটি শিলিং সে কাগজখানা দিয়ে মুড়ে ফেলে দিলেন যখন পদক্ষেপ শোনা গেল বাইরে। তারপর ধৈর্য্যের সঙ্গে অপেক্ষা করতে লাগলেন। কিন্তু দিন গেল, রাত গেল এল না উদ্ধার। আবার তেমনি ঢিল ফেল্‌লেন পরের দিনও।

যে লোকটির মাথায় ঢিল পড়লো সে একটি পরিচারক। কাগজের লেখা পড়ে আর নাম দেখে সে উদ্ধারে লেগে গেল। ইংলিশ পরিচারকরাও খবরের কাগজ পড়ে, ডাঃ সানের নামের সঙ্গে সে পরিচিত। লোকটা একজন বড়লোক বন্ধুকে নিয়ে এল। তারা এলে জানালার নীচে দাঁড়াবামাত্র আর একটা তেমনি ঢিল পড়লো।

তারা দুজনে থানায় গেল। কিন্তু পুলিশ হস্তক্ষেপ করতে রাজি হলো না। বুঝলো তারা ব্যাপার সোজা নয়। নিশ্চয় গবর্ণমেণ্টের কোন গোপন মতলব আছে! বড়লোক বন্ধু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডের গোয়েন্দাদের নিয়োগ করলেন, তারপর, গিয়ে দেখা করলেন পররাষ্ট্র বিভাগের দপ্তরে। সেখানে খবর পেলেন যে

চীন সম্রাটের কড়া আদেশ ডাঃ সানকে জীবিত হোক মৃত হোক বন্দী করে চীনে পাঠাতে হবে।

ধনী-বন্ধু অনেক যুক্তি দেখালেন, অনুরোধ জানালেন। পররাষ্ট্র বিভাগ দোমনা হয়ে পড়লো। চীনের সম্রাটকেও চটাতে চায় না, আবার লণ্ডনে ডাঃ সানকে হত্যা করা হয়, এটাও তারা পছন্দ করে না। সেদিন আর বেশি কিছু হলো না। ধনী-বন্ধু ফিরে এসে পরিচারক বন্ধুকে জানালেন—চীন সম্রাটের বুকে ছুরি মারতে উদ্যত হয়েছ তুমি।

—আমি কারু বুকে ছুরির ঘা মারতে যাচ্ছি নে. একটি নিরুপায় লোককে ছুরির ঘা থেকে বাঁচাতে চাইছি মাত্র। নইলে এমন একটি দেশ-নেতা অকালে প্রাণ হারাবে এটাই কি সঙ্গত!

এদিকে পররাষ্ট্র বিভাগে সভার পর সভা। কোন মীমাংসা হয় না। লিগেশন অফিসার এসেও ডাঃ সান্-এর মুক্তির জন্যই জোর দিলেন। কিন্তু স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড সন্ধান করছে অতি গোপনে। কেউ সে সংবাদ রাখে না।

গোয়েন্দাগণ উদ্ধারের সকল ব্যবস্থা করে বাড়িটা নজরবন্দী রাখলো। তারপর পররাষ্ট্র বিভাগের অনুমতি চাইলো ডাঃ সানকে পুলিশের হেফাজতে রাখতে। নতুবা চীন-সম্রাটের লণ্ডনস্থ রাজদূত হয়তো গোপনে তাঁকে হত্যা করতে পারে।

পররাষ্ট্র বিভাগের সিদ্ধান্ত স্থির হয়ে গেছে তখন। তারা দেখলো চীন সম্রাট চীনে একেবারেই জনপ্রিয় নয়। তাকে সরাবার জন্য বিপ্লব সুরু হয়েছে দেশে। এমন অবস্থায় ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ভাবী রাষ্ট্র-নিয়ন্তা হতে পাবেন, সেটা অসম্ভব নয়। তাই তারা স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডকে পুলিশ সাহায্য দিল।

রাত তখন তিনটে। লণ্ডন শহর নীরব নিঝুম। পুলিশের দল নিয়ে গোয়েন্দারা বাড়ি ঘেরাও করলো। একে একে সব ঘর খোঁজা হলো। অবশেষে অন্ধকার ঘরে বন্দীকে পাওয়া গেল। কিন্তু সেখান থেকে উদ্ধার পেলেও গোয়েন্দাদের নির্দ্দেশে ডাঃ সানকে রাখা হলো পুলিশের পাহারায়। কাকেও সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হত না।

কিছুদিন পরে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন পেলেন মুক্তি। তিনি অগোণে দেশের দিকে রওনা হলেন। সামান্য এক পরিচারকের দয়ায় সে যাত্রা তিনি রক্ষা পেলেন। এর পর তাঁর জীবন-নাশের চেষ্টা হয়েছে চীনে, সে সকল বিপদে ছাত্র-বেষ্টনী হয়েছে পরিত্রাতা।

সামান্য একজন ইংলণ্ডবাসীর এতটা সহানুভূতি দেখে তিনি চিরজীবন ইংলণ্ডবাসীকে ভালবাস্তেন।

কাজেই ছাত্র সমাজের গোপন পরামর্শ-সভায় তারা সাব্যস্ত করে নিল, এখন হতে প্রকাশ্যে কোন কাজই আর তারা করবে না। তা বলে যে তাদের সকল বিপদ কেটে গেল এমন নয়। কোন প্রকারে সন্দেহ হলেই সরকার গোপন পুলিশ লাগিয়ে নানা চতুরতার জালে ফেলে তাদেরে ফায়ারিং স্কোয়াডের হাতে করতো হত্যা।

আত্ম-নির্ভর, আন্তরিকতা, মন্ত্র-গুপ্তি

ক্রমাগত দেশদ্রোহীদের প্রতারণা, অন্তঃসারহীন ধনিকের কার্য্যকালে পিছু হটা—এ সব দেখে-শুনে চীনের ছাত্র আর অপর কারু ওপর নির্ভর না করে নিজের পায়েই দাঁড়াতে শিখেছে। এ ব্যাপারে দেশের কোন নেতাকেও সহজে তারা আমল দেয় নাই। তবে তারা যে কর্ম্মীদল গঠন করে, তার ভিতর থাকে না ভীরু, থাকে না বিশ্বাস-হন্তা। কারণ সে রকম ভাব দেখা গেলে তারা নিজেরাই দেয় সাজা।

কাজেই ছাত্র দেশদ্রোহী হয়ে, দলদ্রোহী হয়ে একে অন্যকে ধরিয়ে দিয়েছে এমন দৃষ্টান্ত চীনে মিল্‌বে না। তবে ছাত্রে ছাত্রে বিরোধ থাকে, মতভেদ থাকে, সে বিরোধ নিতান্তই তাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার, সেখানে দলের কোন সংশ্রব নাই।

তারপরে আন্তরিকতা। তাদের জীবনে কোন শিক্ষা বা কাজই তাচ্ছিল্যের বিষয় নয়। যে কাজেই হাত দিক না কেন, করবে সকল অন্তর দিয়ে। যেমন মার্ক্‌সবাদ পড়ার সময় দেখা গেছে চুল-চেরা হিসাবী বুদ্ধি নিয়ে তারা করেছে আলোচনা। তবে আলোচনাই তাদের মত গঠন ও পথ-নির্দ্দেশের শেষ পরীক্ষা নয়। নিজেরা সে মতে ও পথে হাতে-কলমে পরোখ না করে তৃপ্ত হয় না। আগে কাজ পরে ফলাফল দেখে শেষ সিদ্ধান্ত। আন্তরিকতা, অন্য কথায় লক্ষ্যের প্রতি শ্রদ্ধা, না থাকলে এটি সম্ভব নয়। শ্রদ্ধা তারা পরিপূর্ণভাবে আরোপ করতে পারে বলেই, অর্দ্ধপথে পরাজয় স্বীকার করে না, সিদ্ধিলাভের জন্য পারে প্রাণকে পণ করতে।

শেষ হলো তাদের মন্ত্রণা ও কর্ত্তব্য গোপন রাখার অদ্ভুত শক্তি, যাকে বলে মন্ত্র-গুপ্তি। প্রাণান্তেও তারা করবে না দলের গোপন-কথাটি প্রকাশ। শ্রুত যে

অত্যাচার চলেছে তাদের ওপর, তাদেরে ধরে নিয়ে কায়িক নিপীড়ন চলেছে নিঃসীম, চলেছে প্রলোভনে মুগ্ধ করবার চেষ্টা, তবু একটি কথাও কোন ধৃত ছাত্রের মুখ থেকে বার করতে পারে নাই পুলিশ বা দমনকারী দল। প্রাণের ভয়েও নয়, মুক্তির প্রলোভনেও নয়।

প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ

১৯৩১ খৃঃ আঃ ১৮ই সেপ্টেম্বর। জাপানীরা আক্রমণ করলো মাঞ্চুরিয়া। বিনা বাধায় দখল করে নিল তিনটি প্রদেশই (হাইলেন কিয়ান্, কিরিন্, ফেন্‌টিন্)। প্রদেশের শাসনকর্ত্তারা যাতে জাপানীদের বাধা দিতে না পারে সেজন্য নানকিন সরকার নানা অজুহাতে তাদেরে নান্‌কিনে ডেকে এনেছিল। ছাত্র সম্প্রদায় যখন বুঝলো এটা চিয়াং কাই শেকের জাপানী-পূজা, তখন তারা প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হলো। অন্তঃমঙ্গোলিয়া, সিংকিয়াং এমন কি তিব্বত সীমান্ত পর্য্যন্ত ছাত্রেরা গেরিলা যুদ্ধের তোড়জোড় করতে লাগলো।

লেফ্ঃ জেনারেল দইহারা, জাপানী মিলিটারী গোপন সন্ধানী দলের কর্ত্তা, কিন্তু সকল খবরই সংগ্রহ করছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁর বিভাগের গোপন সন্ধান ও প্রচারই ছিল গোলাগুলী অপেক্ষা ভীষণ। তখন সহসা গুজব রটে গেল জাপানীরা সাংহাই আক্রমণ করবে।

সাংহাইয়ে ছাত্রদের পরামর্শ-সভা বসলো। ছাত্র-সন্ধানীরা জানালো যে, চিয়াং কাই শেক মাঞ্চুরিয়া ছেড়ে দিয়েছেন যাতে কমিউনিষ্টরা সেখানে শায়েস্তা হয়, আর সামন্ত-প্রভুরা (War-lords) তুতুসরা বেগতিক দেখে তাঁর দলে যোগ দিয়েছে। চিয়াং এখন সাংহাইয়ে ডেকে এনেছেন জাপানীদের ছাত্র-সমাজকে নির্য্যাতন করতে। কারণ তারা সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ সংঘর্ষের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তাদের দৃষ্টি সাংহাইয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে অন্যত্রের ব্যবস্থা হালকা হোক। তবু ছাত্ররা হঠাৎ কিছু করে বসলো না। তারা সজাগ দৃষ্টি রেখে অপেক্ষা করতে লাগলো যে কোন মুহূর্ত্তে প্রত্যক্ষ সংঘর্ষে লিপ্ত হতে।

সাংহাইয়ের কমার্শিয়াল প্রেস ছাত্রদের প্রচার প্রতিষ্ঠান। প্রগতি-সাহিত্য, গোপন ইস্তাহার, প্রচার বুলেটিন এখানে ছাপা হয় আর নামমাত্র মূল্যে বিক্রি ও বিলি হয়। কারণ এটা হতে মুনাফা ওঠানো তাদের উদ্দেশ্য নয়। সমগ্র চীনের মনের খোরাক জোগানোই লক্ষ্য।

জাপানীরা গানবোট নিয়ে এল উজাং নদীর মোহনায়। তার পর যাতে উজাং কেল্লা হতে গোলাগুলী ছুড়ে গানবোট্‌কে না ঘাল করতে পারে সেজন্য ফরাসী ও ব্রিটিশ জাহাজ ডাইনে বাঁয়ে নিয়ে ঢুকে গেল ফরাসী বন্দরে। জাহাজ থেকে ফৌজ নামিয়ে ব্রিটিশ কনস্শেসনের ভিতর দিয়ে হাঁটিয়ে নিয়ে কমার্শিয়াল প্রেস করলো ধ্বংস।

অথচ চিয়াং কাই শেক নির্ব্বিকার, উজাং দুর্গাধ্যক্ষ নিশ্চল। জাপানীদের কেউ প্রতিরোধ করলো না, সরকার থেকে মৌখিক প্রতিবাদও না।

এর পরই দেখা গেল উজাং কেল্লার ওপর কামান দাগা হচ্ছে গানবোট হতে। হাজার হাজার নর-নারী প্রাণ হারালো। গোলার দাপট কমলে জানা গেল, কামান দাগার আগেই উজাং কেল্লা খালি করে সকল ফৌজ, ফৌজদার রাতারাতি সরানো হয়েছে। অবাক কাণ্ড! তা হলে এও তো দেশদ্রোহী চিয়াং কাই শেকের চতুরতা, জাপানীদের দিয়ে বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন মাঞ্চুরিয়া-বাসীদের উচ্ছেদ।

ছাত্র সমাজ উত্তেজিত হলো। তারা আরম্ভ করে দিল ধ্বংসাত্মক কার্য্য জাপানী ও চিয়াং সরকার—দুয়ের বিরুদ্ধে। ছোট-খাটো দলে জাপানী সেনা চোখে পড়লেই তারা অতর্কিতে চড়াও হতো আর তাদের প্রাণ বিয়োগ না দেখে ফিরতো না। বোমা বুকে করে জাপানী ট্যাঙ্কের তলায় গড়িয়ে পড়তো—ট্যাঙ্কের সঙ্গে নিজেও হতো চূর্ণ বিচূর্ণ। আবার কোথাও ধৃত হয়ে জাপানীর গুলীতে জীবন দিত। টেলিগ্রাম-তার কাটা, ব্রিজ উড়িয়ে দেওয়া, সরকারী জুলুমবাজকে হত্যা করা হয়ে পড়েছিল নিত্য কর্ম্ম।

মাঞ্চুরিয়া দখলের সময় ও পরে জাপানীদের অত্যাচার চলেছিল অমানুষিক। তরুণদের ধরে নিয়ে শ্রমের কাজে বেগার খাটাতো। একটু অবাধ্য হলে, একটু গাফিলি করলে অমনি গুলী। তরুণীদের ওপর করতো বর্ব্বর নির্য্যাতন।

কাজেই দলে দলে কর্ম্মী তরুণ-তরুণী মাঞ্চুরিয়া ত্যাগ করলো। তাদের সাহায্য করলো চিয়াং সুয়ে লিয়ান্ (চেন সু লিন্-এর পুত্র)। তারপর যখন অগণিত ধর্ষিতা নারী চীনে এসে তাদের দুঃখের কাহিনী জানালো, চিয়াং সরকার সেখানেও করলো ফক্কিকা। এ সমস্ত দুর্দ্দশার নায়ক বলে সরকার চিয়াং সুয়ে লিয়ানকেই দায়ী করলো, কাজেই প্রথমতঃ তাকে সতর্ক করা হলো, তার পর চীন পরিত্যাগ করতে আদেশ দেওয়া হলো।

ছাত্র সমাজ ক্ষিপ্ত হয়ে চিয়াং কাই শেককে হত্যা করতে চেষ্টা করলো। কিন্তু সফল হল না। তারপর গ্রামবাসীদের সহায়তায় জাপানীদের নিকট হতে লুণ্ঠিত অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কিরিন্ ও সিংসিহার জাপানী অধিকার হতে মুক্ত রাখলো। প্রকাশ্য সঙ্ঘর্ষ ছাত্রদের এই প্রথম।

মাঞ্চুরিয়ার মাতাহরি

মাঞ্চুরিয়া অধিকার কালে, ইউরোপ যুদ্ধের বিখ্যাত নারী-সন্ধানী 'মাতাহরি'র মতই একটি নারীর চতুর সাহায্য জাপানীরা পেয়েছিল। ১৯১১ খৃঃ অঃ চীন সম্রাটের বিতাড়নের পরই মাঞ্চুরিয়ার প্রিন্স সুং নির্ব্বাসিত হন। তিনি ডেরিয়ানে চলে যান। কিন্তু তাঁর দশম কন্যা (শিশু) জাপানীদের হাতে পড়ে। শিশুকে তারা জাপানে নিয়ে শিক্ষাদান করে, নামটি দেয় জাপানী—ইয়োশিমকো কোয়াশিমা।

এক জাপানীর সঙ্গে মিস্ কোয়াশিমার বিয়ে হয়। কিন্তু অগৌণে বিবাহ-বিচ্ছেদ করে তরুণী মাঞ্চুরিয়ায় চলে আসে। কারণ চীনা রিপাবলিকের হাতে পিতার বিতাড়ন সংবাদ তাকে প্রতিশোধ নিতে ক্ষিপ্ত করে তোলে। অবশ্য জাপানী-শিক্ষা ও প্রচারই তার মূলে।

এই তরুণী কলেজ-ছাত্রীর বেশে চীনা ছাত্র-ছাত্রীর দলে মিশে বহু ছাত্র-ছাত্রীর প্রাণ বিনাশের কারণ হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও এ তরুণী চীনাদের ক্ষতি সাধন করেছিল ঢের। কিন্তু গেরিলা-নায়িকা 'মসকুইটো মাদার'-য়ের সেয়ানা কৌশলে কোয়াশিমা ধৃত হয়। সে আটক অবস্থা থেকে পলায়ন-কালে গেরিলা রক্ষীদের গুলীতে আহত হয়। তারপর জাপানী হাসপাতালে তার মৃত্যু হয়।

বিভিন্ন কর্ম্মী

প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের সময়ও ছাত্রদের ভিতর দুটি বিভিন্ন কর্ম্মে লিপ্ত দল দেখা যায়। এক দল (ন্যাশনালিষ্ট) সকল প্রকার বিনাশের কাজে নিরত। অপর দল সংগঠনকারী। তার কারণ সাধারণ চীনা ছাত্র গুণ্ডাগিরি পছন্দ করে নাই।

সংগঠনকারী দল করতো কৃষক-মজুরের সঙ্গে মিশে জনমত গঠন। তারা বেশ জান্‌তো, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অত্যাচারের প্রতিবিধান তাদের হাতে নাই,

যদি তারা পাল্টা আঘাত হানে তবে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী মরিয়া হয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করবে, আর সকল সাম্রাজ্যবাদী একযোগে কাজ করবে, চীনের দুর্দ্দশার অন্ত থাক্‌বে না।

তাই তারা কোন একক সাম্রাজ্যবাদীর ওপর চড়াও হতো না, যদিও জাপানী তাদের চিরশত্রু আর শ্বেতকায় ঘৃণ্য। কারণ একের ওপর দশের একযোগে আক্রমণকে তাদের দেশে 'শূকর ভোজ' নামে হেয় করে রাখা হয়েছে।

ছাত্র সমাজে সাম্প্রদায়িকতার সৃষ্টি করার চেষ্টাও হয়েছিল। ভ্রমণকালে দেখেছি এক শোভাযাত্রা ভাড়াটে গুণ্ডা সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হতে। তাতে ইসলামের কুৎসা রটিয়ে স্লোগ্যান, বীভৎস চিত্র প্রদর্শন। কিন্তু মুসলমান সমাজ নীরব। মুসলিম ছাত্ররা শুধু শোভাযাত্রাকারীদের শ্লেষ করে মুখোস্ খুলে দিয়েছে—কার টাকায় লাফাচ্ছিস্? ক'হাজার পেয়েছিস্?—ব্যস্। আর কোন বিক্ষোভের সৃষ্টি হয় নাই, আগেও না, পরেও না।

ডাঃ সান ইয়াৎ সেন ছিলেন কমিউনিষ্ট আর কুওমিন্তাং-য়ের 'সেতু' স্বরূপ। তাঁর মৃত্যু হলে কুওমিন্তাং-য়ের দুর্নীতি কমিউনিষ্টদের কর্‌লো কার্য্যতঃ স্বতন্ত্র, কারণ তাদের কর্ম্মসূচী পৃথক। এ সময় ছাত্র-সমাজ আবার সে সেতু গড়ে তুললো মাও সে তুনের পন্থা সমর্থন করে। ক্রমে উভয় দলের নিয়ন্ত্রণে চমৎকার এক সেনাবাহিনী গড়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদের মূলে নিক্ষিপ্ত হয় প্রচণ্ড আঘাত। ব্রিটিশ কনস্কেশন হংকং-এ মজুর শ্রেণী সমগ্র অঞ্চলকে দেয় অচল করে।

তখন মাও সে তুন ছিলেন কুওমিন্তাং কমিউনিষ্ট মিলিত প্রতিষ্ঠানের প্রচার দপ্তরের প্রধান কর্ত্তা। আজকেকার চৌ এন লাই সেদিন ছিলেন মিলিত প্রতিষ্ঠানদ্বয়ের সামরিক সংগঠক।

চীন-জাপান যুদ্ধ

তারপর এল জাপানী আক্রমণ (১৯৩৭)। ওয়ার-লর্ড সেনাপতিরাও চিয়াং কাই শেকের কারসাজিতে বিরক্ত হলেন। কিন্তু চিয়াং-এর বিরোধী হলেন না স্বার্থের দায়ে। কিন্তু ছাত্র-সমাজ মাও সে তুনের অনুকরণে গণ-বিপ্লবের পথ পরিষ্কার করলো, তবু তারা মাও সে তুনের সেনানী পদে ভর্ত্তি হয় নাই, বা চিয়াং...

কাই শেকের দলে যোগ দেয় নাই। ডাঃ সান গোঁজা মিল দিয়ে আপোষ করতে যেয়ে সব হারালেন, ছাত্ররা তা বেশ লক্ষ্য করেছে।

ক্রমে জাপানী অভিযান দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অঙ্গ হলো। চিয়াং কাই শেক দুমুখো নীতি চালালেন। এক দিকে জাপানকে প্রতিরোধ করবার অজুহাতে বিদেশ হতে সাহায্য গ্রহণ করে আপন শক্তি বর্দ্ধন, রাজকোষ পরিপূর্ণ করণ, অন্যদিকে স্বদেশে জাপানীদের বিরুদ্ধে কমিউনিষ্ট-বাহিনীকে ঠেকিয়ে দিয়ে আপন সৈন্য অটুট রাখা। উদ্দেশ্য ভাবীকালে কমিউনিষ্টদের নিশ্চিহ্ন করা।

জাপানীরা নানকিনের বুকে দুর্দ্দামতা চালাচ্ছে। চিয়াং-ফৌজ নিশ্চেষ্ট হয়ে শেন্সি প্রদেশে বসে রইলো, এক পা-ও নড়লো না। হাংকো, লেনিন স্চো, সাংটান্—সর্ব্বত্র চললো জাপানী বর্ব্বরতা। চিয়াং কাই শেক নিস্তব্ধ। দেশদ্রোহী রূপটি ছাত্ররা ভাল করে বুঝে নিল। তা বলে কর্ত্তব্য হতে চ্যুত হলো না তারা। প্রত্যক্ষ সঙ্ঘর্ষের (১৯৩১) পুনরাবৃত্তি করে চল্লো। এ দুর্দ্দিনে মাও সে তুনের পরিচালনায় তারা সঙ্ঘবদ্ধ ও সংযত হয়েছিল।

জাপানের নিদারুণ আক্রমণে চীন বিধ্বস্ত। কিন্তু অসীম সে নির্য্যাতন করেছে সকল সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ। নিষ্ঠুর সমরের অভিশাপ হতে উত্থিত একমাত্র আশিস্ এই।

সকল স্থানেই জাপান করে চলেছিল বিদ্যালয় ও শিক্ষা-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানের ব্যাপক ধ্বংস। তারপর চীনের শিশু-শিল্প—সাংহাই নানকিন হাংচায়ের কল কারখানা, বোমা ডিনামাইট কামান সাহায্যে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। ইয়াংসি নদীর ব-দ্বীপ অংশে শুধু পনর শত মিলিয়ন চীনা ডলার খাটানো হচ্ছিল। শিল্প কারখানা, সূতা ও কাপড়ের কল আগুনে পোড়ানো হয়েছে।

তবে ছাত্র-সমাজের ধ্বংসাত্মক কার্য্যে সিংটাও বন্দরের জাপানী কাপড়-কলগুলা বিনাশ পেয়েছে। তিনশত কোটি ইয়েন মূল্যের তৈরি মাল ও কলকব্জা হয়েছে বিনষ্ট।

বিশ্ব-বিদ্যালয় অট্টালিকা অধিকাংশ বিনষ্ট, মাত্র দু-একটি অব্যাহত রয়েছে। তা ছাত্রদের জন্য বন্ধ করে সেখানে জাপানী সেনার কোয়ার্টার্স দেওয়া হয়েছে। পাঠশালা ও মধ্য স্কুলসমূহে এরি মধ্যে জাপানীদের প্রচারমূলক পাঠ্যপুঁথি পড়াতে বাধ্য করা হচ্ছে। ইংরেজী বা অন্য ইউরোপীয় ভাষার বদলে জাপানী ভাষা না পড়ালে সে স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয়। শিক্ষকদের বন্দী করা হয়।

কোন কোন কারাগার থেকে হত্যাকারী, গুণ্ডা প্রভৃতিকে মুক্তি দিয়ে, তাদের সাহায্যে আফিম ও অন্যান্য মাদক দ্রব্য চীনাদের ভিতর চালাতে চেষ্টা চলছে। চীন সরকার আফিম ও যে সকল মাদক দ্রব্য আইনের বলে রদ করেছিল, জাপানীরা নেশাখোর ও মাদক-নির্ম্মাতাদের দ্বারা শান্তি রক্ষা সমিতি গঠন করে সে সকল মাদকের প্রচার করছে।

অনেক চীনা প্রতিষ্ঠান সমরারম্ভেই কলকারখানা তুলে নিয়ে গেছে পশ্চিমের পার্ব্বত্য অঞ্চলে। কিন্তু সাউথ মাঞ্চুরিয়ান রেলওয়ে কোংএর ন্যায় চীনাদের গঠিত রেলওয়ে, পোর্ট ট্রাষ্ট ও যান-বাহন প্রতিষ্ঠান জাপানীরা দখল করেছে। ইলেকৃট্রিসিটি, গ্যাস্, জলের কল, খনি ও মৎস্য ব্যবসায় জাপানের হস্তে।

পিকিন শহরের পনর শত বৎসরের পুরাতন সংবাদপত্র 'পাইপিং বাও' জাপানীরা ধ্বংস করেছে, উহাতে জাপান-বিদ্বেষ প্রচার করা হতো বলে। সম্পাদককে প্রথমটা অর্থে বশীভূত করার চেষ্টা চলে। কিন্তু সম্পাদক ঘৃণার সঙ্গে উৎকোচ প্রত্যাখ্যান করায়, গোপনে তাকে হত্যা করা হয়। তথাপি 'পাইপিং বাও' নির্ভীক ভাবে জাপানের বিরুদ্ধে জনগণকে উত্তেজিত করে, তাতেই পত্রিকা বন্ধ, অফিস মুদ্রাযন্ত্র বিনাশ-প্রাপ্ত।

হঠাৎ যুদ্ধ হলো সমাপ্ত। জাপানীরা করলো আত্মসমর্পণ, কিন্তু যারা প্রাণপণ শক্তিতে যুদ্ধ করেছিল দেশকে বাঁচাতে, তাদের হাতে নয়। তারা আত্মসমর্পণ করলো সুবিধাবাদী চিয়াং কাই শেকের প্রতিনিধির কাছে।

ছাত্র-সমাজ প্রচণ্ড বিক্ষোভের সৃষ্টি করলো। তারা এবার মাও সে তুনের পতাকাতলে সমবেত হলো। জাতীয় জাগরণের বন্যায় সারা দেশ প্লাবিত হলো। মিলিত সামরিক বাহিনী উত্তর চীনে মহা অভিযানে বাহির হলো।

এরূপ ছাত্র-সমাজ যে কোন দেশের সর্ব্বোচ্চ সম্পদ। সমগ্র সাম্যবাদী ভুবনের তারা ধন্যবাদের পাত্র।

চীনে নারী-বাহিনী

নারী-কর্ম্মীর মর্ম্মবাণী

অপ্রমেয় ধ্বংসলীলা যখন চলেছে সাংহাইয়ের ওপর চীন-জাপান যুদ্ধের আবর্ত্তে সে সময় 'চাইনিজ উইমেন ওয়ার সারভিস কোর' গঠিত হয়। প্রথম বিভিন্ন জাপানী কটন মিল্-এর নারী শ্রমিক ত্রিশজনকে দলভুক্ত করা হয়।

নানা রকমেই চীনের নারী সহায়তা করেছে যুদ্ধকালে, কিন্তু সেনা-বাহিনী গঠন এই প্রথম। পোষাক পুরুষ সৈনিকের মত, হাতে রাইফেল, মাথায় লোহার টুপী, দৃঢ়তা ব্যঞ্জক মুখমণ্ডল—জাতির প্রাণে উৎসাহ জাগিয়েছিল অসীম।

এ নারী-সেনাদলের নেত্রী মিস্ হু-লান-চি। দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ-কালে তিনি কমিউনিষ্ট সন্দেহে হন নিপীড়িত। শেষ জাপানী গোপন সন্ধানী দলের হাত এড়িয়ে-চলে যান জার্ম্মানী। বার্লিনের জার্ম্মান পলিটিক্যাল ইন্‌ষ্টিটিউটে ভর্ত্তি হন। জাপানী সন্ধানীরা এখানেও তাঁকে বিপদে ফেলে। 'য়্যান্টি ইম্পিরিয়ালিজ্‌ম্ লীগ' গড়ে উঠে জার্ম্মানীর ভিতর আলোড়নের সৃষ্টি করে।

মিস্ লান্ চি এ প্রতিষ্ঠানের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হলেও প্রত্যক্ষ লিপ্ত ছিলেন না। তবু রাইক (Reich) ১৯৩৩ খৃঃ অঃ তাঁকে বন্দী করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। কারাগারে বসে তিনি 'ডায়েরি ইন্ এ জার্ম্মান্ প্রিজন' নামক প্রসিদ্ধ পুস্তক লেখেন। ক'মাস পরে তিনি মুক্ত হন নির্দ্দোষ বলে।

দেশে ফিরে জনগণের ভিতর জাগরণ আনয়ন করতে লেগে যান। অতি চতুর কৌশলে জাপানীদের গুপ্ত সমিতির শত চেষ্টা ব্যর্থ করে গৃহীত ব্রতাচরণ করতে থাকেন। তারপর এল জাপানী অভিযান।

উইমেনস কোর্-এ অল্প দিনে হাজার হাজার নারী-কর্ম্মী যোগদান করে। শ্রমিক-নারীর সংখ্যা বেশি হলেও কলেজ ছাত্রী এলেন কম নয়—তাঁরা অফিসার্স ট্রেনিং পেয়ে অসামান্য কার্য্য করেছেন যুদ্ধকালে।

শ্রমিক-নারীগণ বিদেশী কারখানায় পেয়েছে নিদারুণ লাঞ্ছনা ও নারীর চরম অবমাননাকর দুর্দ্দশা, তাই তারা দেশকে মুক্ত করতে এগিয়ে এসেছে বিদেশীর হাত থেকে, পুঁজিপতিদের হাত থেকে। আট মাস শিক্ষার পর তারা সামরিক

বিভাগের কার্য্যে নিযুক্ত হয় সাংহাই-নানকিন রেলপথে ষ্টেশন রক্ষায়, ব্রীজসমূহ রক্ষায়। একদল (প্রায় তেরশত) যায় এনহোয়েই যুদ্ধক্ষেত্রে।

এদের অধিকাংশই তরুণী, তবু এরা আশ্চর্য্য নিপুণতা লাভ করেছে যুদ্ধ বিদ্যায়। এদের গুলী লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় না, আবার জীবনে এই প্রথম যুদ্ধক্ষেত্রের বিভীষিকাময় আবেষ্টনে পদার্পণ করলেও ভীত বা বিচলিত হয়ে পড়ে নাই।

স্নায়ু-পীড়াদায়ক হত্যাকার্য্য, প্রলয় গর্জ্জনের মত অবিরাম বোমা বিস্ফোরণ ও তোপের ধ্বনি সহ্য করে স্থির থাকতে পারে, এমন বীর-পুরুষের সংখ্যা বেশি নয়, তাতে নারীর পক্ষে ধৈর্য্য ও সাহস অটুট রাখা দুঃসাহসিক সন্দেহ নাই।

প্রকৃত যুদ্ধ ছাড়াও এরা সময় সময় কাজ করেছে এম্বুলেন্সে, যদিও সেখানে এম্বুলেন্স নারী বাহিনী ছিল। করেছে রান্না ও আহারদানের কাজ, করেছে সেবাশুশ্রূষা। তবে এদের সবসেরা কাজ ছিল সৈনিকদের উৎসাহ দান, ত্যাগের আদর্শের মহিমময় জয়গানে প্রতিটি সৈন্যের অন্তরে ইচ্ছাশক্তি সঞ্চার। কিন্তু নীতিহীনতার লেশও দেখা যায় নাই।

সমরের সঙ্গে সঙ্গেই জাপানীরা দেখতে পেল চীনজয় অর্থহীন হবে যদি না চীনাদের হৃদয় জয় করা যায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে। তাই তারা প্রচার স্থরু করলো চীনাদের ভুলাতে। কিন্তু নারী-বাহিনী সে ফাঁদে কাউকে পা দিতে দেয় নাই।

অসমসাহসিকতার পরিচয় পেয়ে দেশবাসী মিস হু-লান-চি'র নামকরণ করেছিল 'জোয়ান্ অ্ব আর্ক অব চায়না'। তিনি সকল কর্ম্মীকে সদা স্মরণ রাখ্‌তে বল্‌তেন—

চীনের সন্তান হয়ে যারা জাপানীর দাস তাদেরে দেবে শাস্তি। একটি বিশ্বাসঘাতকের মৃত্যু একশত শত্রু নিধন অপেক্ষাও কাম্য।

মোঙ্গল-রাণী শিহ্

পাইপিং স্থইয়ুন রেলপথের সর্ব্ব-পশ্চিম সীমান্ত পাওটাও হতে সত্তর মাইল পশ্চিমে, পীত নদীর বৃহৎ বাঁকের উত্তরে 'উলাতে ব্যানার' রাজ্য। অন্তঃমঙ্গোলিয়ার 'উলাঞ্চার লীগ' সম্মিলিত রাষ্ট্রের একটি ইউনিট। এদের জাতির অধিকাংশই যাযাবর ও অশ্বারোহণ পটু। এরা চেঙ্গিস খাঁয়ের বংশধর বলে গর্ব্ব করে থাকে।

১৯৩৬ খৃঃ অঃ রাজা শিহ্ মারা যান। রাণী শিহ্ সদ্যজাত শিশুপুত্র কোলে করে সিংহাসনে বসেন। কিন্তু রাজ্যময় ষড়যন্ত্র চল্‌তে থাকে সর্দ্দারগণের ভিতর চতুর জাপানের প্ররোচনায়। তার একটু কারণ ছিল।

দুই বৎসর আগে প্রতিবেশী রাজা তেহ্‌কে সরল ও বুদ্ধিহীন পেয়ে জাপানীরা উস্কায় কেন্দ্রীয় চীন সরকারের অধীনতা হতে মুক্ত হতে। সঙ্গে যোগ দেয় উলাঙ্কার লীগের আরো কয়েকটি রাজা। কিন্তু রাজা শিহ্ বাধা দেন। সংখ্যায় রাজা শিহ্‌য়ের দল বড়। বিদ্রোহীরা যুদ্ধে পরাস্ত হয়। কিন্তু শত্রুতা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

এখন সিংহাসনে একটি নারী। জাপানীরা সুবিধা বুঝে উলাতে ব্যানার রাজ্যের কয়েকটি সর্দ্দারকে অর্থের লোভে আকৃষ্ট করে এ রাজ্য আক্রমণ করে। জাপানী সেনাদল উত্তর চীনের সমতল ক্ষেত্র পার হয়ে অগোণে পাওটাওতে পৌছালো। তখন প্রতিবেশী রাজা তেহ জাপানীদের দলে যোগ দিল।

রাণী শিহ্‌এর দুর্দ্ধর্ষ অশ্বারোহী সেনা ছিল। তবু বিপুল জাপানী সেনাকে প্রতিরোধ করা সহজ নয়। তিনি প্রথম উলাঙ্কার লীগের কাছে সাহায্য চাইলেন বিদেশী শত্রুর বিরুদ্ধে, কিন্তু কেউ সাহায্য কর্‌লো না। চীন কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি রাজা শিহ্‌এর আনুগত্য একজিকিউটিভ ই[illegible]নের প্রশংসা অর্জ্জন করেছিল। তাই রাণী কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট আবে[illegible]ন কর্‌লেন।

কেন্দ্রীয় সরকারও দুই দল সেনা পাঠালেন। শক্তিশালী দল গেল পাওটাওতে জাপানী ঘাঁটি আক্রমণ করতে আর ছোট দলটি গেল রাণীর সাহায্যে।

প্রিন্স তেহ্ নিজ সৈন্য ও কিছু জাপানী সে[illegible]য়ে রাণীর রাজ্যের দিকে রওনা হলো। চীনা সৈন্য আসছে এ সংবাদ জ[illegible] পেল গুপ্তচর মারফত। তখন তারা পাওটাও থেকে আর এক দল ফৌজ [illegible]ন্স তেহ্‌এর সাহায্যে। পাওটাও হতে উলাতে ব্যানার রাজ্য এক দিনের [illegible]র পথ।

জাপানী ও প্রিন্স তেহ্‌এর মিলিত সে[illegible]াদ অবরোধ করলো। রাণীর বীর যোদ্ধারা এ বৃহৎ সেনার আক্র[illegible] রাখতে পারলো না। তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। তখনও চীন সরকা[illegible]সে পৌছায় নাই।

রাণী দমে গেলেন না। প্রাসাদ হতে [illegible]রা কামান দাগ[illegible] উপর্য্যুপরি, এই ফাঁকে রাণী মাত্র একশত [illegible]রোহী সেনা সঙ্গে করে বিদ্যুৎগতিতে বেরিয়ে জাপানী সেনা ভেদ [illegible] গেলেন। জাপানারা

এমন একটা ব্যাপার ভাবতেও পারে নাই। এমন অবশ্য মরণের মুখে স্বেচ্ছায় কেউ পা দেবে, এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। তাই রাণীকে ঘেরাও করে তাদের ক্ষিপ্রগতি টাট্টু ঘোড়ায় রক্ষীরা সমর্থ হলো শত্রু-সেনা পশ্চাতে রেখে আস্তে। তবে রক্ষীদের প্রায় সত্তর জন প্রাণ হারালো জাপানীদের গুলীতে।

তাদের সাহায্য করেছিল দুর্গের কামান। রাণীও রাইফেল চালিয়েছেন শত্রু সৈন্যকে হতভম্ব করতে। শিশুপুত্র (দু' বৎসর বয়স) ছিল তাঁর বুকে বাঁধা। আর উলাতে ব্যানার রাজ্যের সকল নারীই অশ্বারোহণে পটু, কারণ তাদের সামাজিক রীতি বাড়ির বাহিরে পদব্রজে যাবে না। রাণী অশ্বের বল্গা না ধরেই হাঁটু সাহায্যে অশ্ব চালনা করেছিলেন। তাঁর শুধু ভয় ছিল অশ্বটি না ঘাল হয়।

জাপানীরা রাণীর পশ্চাদ্ধাবন করবার পূর্ব্বে রাণী ও রক্ষীরা পাহাড়ে রাস্তায় অদৃশ্য হয়ে যায়। পরের দিন তাঁরা ৮০ মাইল দূরে চীনা সৈন্যের উওয়ূন ঘাঁটিতে আশ্রয় পান। উলাতে ব্যানার রাজ্যের দক্ষিণ পশ্চিম কোণে এ ঘাঁটি। জেনারেল মেং পিং ইও তাঁদের উপযুক্ত আবাস দেন আর রাণীর বীরত্ব কাহিনী কেন্দ্রীয় সরকারকে জানান।

রাণীর নিরাপদ আশ্রয়-প্রাপ্তি ও বীরত্বের ইতিহাস জেনে চীনবাসী আনন্দিত হয়। চীন কেন্দ্রীয় সরকারের একজিকিউটিভ ইউয়ানের সভাপতি ডাঃ এইচ্ এইচ্ কুং, রাণী শিহ্‌কে তিন হাজার ডলার পুরস্কার দিয়ে তাঁর আনুগত্যের মর্য্যাদা বৃদ্ধি করেন। কারণ তিনি সমগ্র দেশবাসীর সঙ্গে একমত যে রাণী শিহ্ বীরত্বে চীনের মুখ উজ্জ্বল করেছেন।

গেরিলা বাহিনী

উত্তর চীন দখল করে জাপান দেখ্‌লো, বড় বড় শহর ও রেল-কেন্দ্রগুলা ছাড়া কোথাও শাসন বিভাগের অস্তিত্ব নাই। গ্রামাঞ্চলগুলা প্রবল প্রতিরোধ ঘাঁটি। সেখানে গোপনে প্রচার চল্‌ছে আর গেরিলা দলের উৎপাত ক্রম-বর্দ্ধমান হচ্ছে।

আগেই বলেছি মস্‌কুইটো মাদার্ গেরিলা-দল গঠন করেন চীনে। পরে বহু স্থানে অনুকরণে গেরিলা-বাহিনী তৈরি হয়েছে। কিন্তু স্বেচ্ছা-সেবিকা-দল করেছে জনগণের সঙ্গে গেরিলাদের যোগাযোগ।

এজন্য জাপান-সরকার স্পেশ্যাল পুলিশ নিযুক্ত করে এ সকল প্রচার-কারিণীদের গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করেছে। পুলিশ চীনাদের গৃহে দিনে একবার ও রাতে একবার যেয়ে লোকসংখ্যা গণনা করেছে। প্রাতে যা লোক ছিল রাতে যদি তার একজন বেশি হয়, তবে সে অতিরিক্ত লোকটিকে গেরিলা বা প্রচারকারী সন্দেহে বন্দী করা হতো। প্রতিবাদ জানালে তৎক্ষণাৎ করা হতো গুলী।

এত বিপদ মাথায় করেও প্রচারকারিণী দল নানা বেশে সে অঞ্চলে প্রবেশ করেছে। কেউ গেছে বাঁক ঘাড়ে করে ফলমূল ফিরি করতে, তার বাঁকেব এক পাল্লায় থাক্‌তো একটি শিশু শায়িত, অপর পাল্লায় পণ্য। কোন নারীকর্ম্মী আবার কান দেখা, কান পরিষ্কার করার যন্ত্রপূর্ণ বাক্স নিয়ে যেতো। আবার কেউ যেতো আফিং বিক্রির অছিলায়। পাগলিনী বা অন্ধ সেজেও কেউ কেউ গিয়েছে।

এ অঞ্চলের শাদা রুশরা এ সুযোগে জাপানের তাঁবেদার হয়ে এ সকল নারী-কর্ম্মীদের আশ্রয় দিয়ে ধরিয়ে দিতো। তথাপি নারীদল কর্ত্তব্য পালনে বিমুখ হয় নাই। কাজেই সংবাদ আদান-প্রদান ও পথ চলাচল—সবেই হয়ে পড়েছিল জাপানী সমর বিভাগের রক্ষণার প্রয়োজন।

মস্‌কুইটো মাদার্ তাঁর পিকিনের নিকটস্থ মূল আড্ডায় চুপ করে বসে ছিলেন না। সেখানেও গেরিলা-দলের গোপন অভিযান চলেছিল। একদিন খবর এল পিকিন শহরের গুপ্ত আড্ডা থেকে যে তাদের কয়েকটা রাইফেল আর কার্ত্তুজ দরকার। এদিকে শহরে প্রবেশের যতগুলি রাস্তা আছে, তাতে জাপানীরা কড়া পাহারা দিচ্ছে। মস্‌কুইটো মাদারের গেরিলা বাহিনী কেউ কোন মোট-ঘাট নিয়ে শহরে প্রবেশ করতে পারলো না, ফিরে এল জাপানী রক্ষীদের খানাতল্লাসের বহর দেখে। অথচ মস্‌কুইটো মাদার বুঝলেন, অবিলম্বে অস্ত্র-শস্ত্র না পৌছাতে পার্‌লে গেরিলারা পিকিনের বুকে কোন কাজ কর্‌তে পারবে না।

তাই বৃদ্ধা এক সেয়ানা মতলব আঁটলেন। তারপরই দেখা গেল পিকিন শহরের প্রধান প্রবেশ-পথে ঢুকলো একটা ছাগলটানা দুধের গাড়ি। ছাগলটা বড়, দুধের কেঁড়েগুলাও তেমনি বড়। হঠাৎ রক্ষী এসে পথ আগলে দাঁড়ালো। জিপ্‌সি-বৃদ্ধা রোমানি-জগতের সকল দেবতার নামে শপথ কেটে একটা কাপ নিয়ে কেঁড়ে থেকে দুধে পূর্ণ করে রাস্তায় ঢেলে দিল। কেঁড়ের মুখ না খুলে কাপ পূর্ণ করবার কৌশল ছিল।

দুধ ঢেলে দিল এজন্যে যে সে ভালোভাবেই জানে জাপানী রক্ষী দুধ খাবে না। রক্ষী বৃদ্ধার হাবভাব দেখে সন্দেহের কিছুই পেল না, বেশির ভাগ বুঝে নিল কেঁড়েগুলা সত্যিসত্যি দুধের। তাই ছেড়ে দিল পথ।

বৃদ্ধা তখন ছাড়ান পেয়ে মনে মনে হেসে হাঁকিয়ে চললো গাড়ি। দূর থেকেই দেখতে পেল আবার বড় রাস্তার চৌমাথায় জাপানী পাহারা। তাই সে চট্‌পট্ একটা গলিপথে ঢুকে পড়লো। তারপর অনেকটা ঘুরা পথে তাদের গুপ্ত আড্ডায় হাজির হলো। সেখানে দুধের কেঁড়েগুলার মুখ খুলে দুধে পূর্ণ সস্‌প্যান সরাতেই তলায় দেখা গেল—কতকগুলা রাইফেল আর কার্তুজের বাক্স।

অস্ত্রশস্ত্র গেরিলাদের বুঝিয়ে দিয়ে, সলা-পরামর্শ দিয়ে ঘণ্টা তিনেক বাদে বৃদ্ধা ফিরলো। তখন দেখা গেল কতকগুলা চীনা মূলা আর শুঁটকি মাছ তার দুধের কেঁড়ের মুখে সাজানো। ঘাড়ে তার একটা মর্কটের বাচ্চা বসে আছে, দড়ি দিয়ে বুড়ীর কোমরবন্ধের সঙ্গে বাঁধা।

বুড়ী তার কোঁচড় থেকে সয়াবিন একটি করে তুলে নিচ্ছে, নিজেও খাচ্ছে, মর্কটকেও খাওয়াচ্ছে।

প্রধান প্রবেশ পথ থেকে বেরোবার সময় রক্ষীরা তাকে দেখে বুঝলো দুধ বেচে জিপসি বুড়ী এ-সব সওদা করে এবার বাড়ি ফিরছে।

এরকম চাতুরী ছিল মসকুইটো মাদারএর নিত্য কার্য্য। মাথা ঠাণ্ডা রেখে এ জাতীয় দুঃসাহসিকতা চীনা-নারীকে কত করতে হয়েছে যুদ্ধকালে তার শেষ নাই।

আর একটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ করতে হয়েছে স্বেচ্ছাসেবিকাদের। তা হলো, দুঃস্থ অভাবগ্রস্ত পল্লীবাসীদের ভিতর অর্থ ও আহার্য্য বিতরণ। নিয়ন্তা হলো কমিউনিষ্ট-পার্টি। স্বেচ্ছাসেবিকাদের অনেকেই শ্রমিক। মোট বয়ে নিতে অভ্যস্ত, তাই এ কার্য্যে তাদের কোন কষ্ট হয় নাই।

যেমন ছাত্র-সমাজ তেমনি চীনের নারী-বাহিনী দেশের জন্য না করতে পারে এমন দুঃসাধ্য কাজ বুঝি দুনিয়ায় কিছু নাই।

বীরাঙ্গনা লি পাই চাং

চীনের সকল আন্দোলনেই নারীগণ এসে পুরুষের সঙ্গে সমান তালে পা ফেলে চলেছে, পিছিয়ে পড়ে থাকে নাই। আর চীন-জাপান-যুদ্ধের সময় সেটা যেমন

প্রকট, এমন প্রকট, এমন প্রধান অংশ গ্রহণ করতে আর তাঁদের অন্য কোন সময়ই দেখা যায় নাই।

এখানে স্মরণ রাখতে হবে যে অকৃত্রিম সংবাদ চীনের বাইরে বড় একটা প্রচারিত হয় না। কারণ সে সংবাদ পরিবেশনের মুরুব্বি হলো বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পরিচালিত সংবাদ-সরবরাহ সঙ্ঘ, যারা নিজেদের স্বার্থের অনুকূল না হলে প্রকৃত তথ্যকে বাহিরে প্রকাশ করে না।

প্রকৃত প্রস্তাবে শুধু যুদ্ধের সময় কেন, শান্তির সময়েও নারী-কর্মীর অভাব ছিল না চীনের রাজনৈতিক আকাশে। যুদ্ধের সময় সে কর্মীর সংখ্যা যে হয়ে পড়ে অন্য কোন দেশ-অপেক্ষা শতগুণে বেশি, তা নারী-পল্টন গঠনেই প্রকাশ পেয়েছে।

মস্কুইটো মাদার্-এর মত গোপনে কার্য্য-রত নারী ছিল শত শত। তরুণী লি পাই চাং বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী। কুওমিন্তাং সভ্য হয়েই দেশের কাজ করেন। তবু চিয়াং সরকারের মনোবৃত্তি তাঁর পছন্দ নয়। জাপানের চীন-অভিযান আরম্ভ হবার পর সরকারের শাসন ও শোষণ চরমে উঠেছে। দেশের লোক একেবারে জর্জ্জর। যে জাতীয়তাবাদী কর্ম্মী জাপানকে প্রতিরোধ করতে ব্যাপৃত, সে-ই চিয়াং-এর চক্ষুশূল। আর সে কর্ম্মীর গোপন হত্যা অবধারিত।

বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করে লি পাই চাং বিবাহিত হয়ে স্বামীকে নিয়ে গোপনে কাজ সুরু করলেন। স্থায়ী আশ্রয় হলো তাঁদের কমিউনিষ্ট এলাকায়। কার্য্যক্ষেত্র হলো পার্শ্ববর্ত্তী চিয়াং সরকারের জুলুমের অরাজক রাজ্য। সেখানে তিন লক্ষ লোকের বাস। চাষের জমি অর্দ্ধের বেশিই জমিদারদের খাস। এরা আবার জাপানীদের তাঁবেদার। কারণ চিয়াং কাই শেক যুদ্ধনেতা ও জমিদারদের হাতে রেখে তাদের দিয়ে পল্লী শাসন করেন। কুওমিন্তাংয়ের আইন ও শাসন শুধু শহরগুলায় বলবৎ।

প্রকাণ্ড একটা গ্রাম, জমিদার সেখানে কান্ নামে পরিচিত এক স্বার্থপর শোষক। প্রায় কুড়ি হাজার লোককে পদদলিত করে তার রাজ্য-শাসন। তার ওপর জাপানী-তোষণ।

মালিক জাপানী চেয়ে পাঠালো—পঞ্চাশটি মজুর চাই। অনুগত ভৃত্যের মত কান্ নিয়ে এল এক শ' মজুর তাদের ডেরা থেকে টেনে। তারপর পঞ্চাশজনকে জাপানীর কাজে লাগিয়ে বাকি পঞ্চাশজনকে অব্যাহতি দিল মাথা পিছু দু'ডলার

আদায় করে। জাপানীদের কাছ থেকে মজুরদের নাম করে শীতবস্ত্র ও খাদ্য সাহায্য সংগ্রহ করে চড়া দামে বিক্রি করতো মজুরের দলের কাছে।

জাপানের পতনের পর কান্ তার পল্টনে লোক-সংখ্যা বাড়িয়ে একশ' করে নিল। কুওমিন্তাংকে জানিয়ে দিল গ্রামের বিচার-ব্যবস্থা, শান্তি স্থাপন সব ভার তার। সরকার খুশি হয়ে তাকে কম্যাণ্ডার খেতাব দিয়ে সকল ক্ষমতা অর্পণ কর্‌লো। ফলে হল এই যে, কান্ তবু জাপানীদের ভয় করে চল্‌তো, কিন্তু কুওমিন্তাং সরকারকে সে গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

কান-এর জুলুম বেড়ে চল্‌লো। একটি দুটি করে প্রজারা কমিউনিষ্ট এলাকায় পালাতে লাগলো। কান্ তাদের পরিত্যক্ত পরিবারের নর-নারীকে এনে করে বেত্রাঘাত। কেউ আদেশ অমান্য কর্‌লে, প্রতিবাদ করলে চলে অনুরূপ নিপীড়ন।

তরুণী লি পাই চাং তাঁর স্বামী ও সঙ্গী কয়েকজন নিয়ে ছদ্মবেশে প্রবেশ করলেন সে মুলুকে। প্রকাশ্যে তারা চাষী-মজুর, কিন্তু সত্যকার তারা গেরিলা বাহিনী। মজুরের কাজ করে বেড়ায় তারা, গোপনে খবর নেয় কান্-এর আর তার পল্টনের। তার পর একদিন গভীর রাতে যখন পল্টনের নেতা ও দশ বারোজন পানাহারে মত্ত সেই সময় তাদের করা হয় উচ্ছেদ। বাকি পল্টন তো সবই মজুর, নিরীহ, গোবেচারি। তাদের দলে টান্‌তে বেগ পেতে হলো না। কারণ তারাও কান্-এর উৎপীড়নে মনে মনে বিদ্রোহী। আরো যোগ দিল ক্রমে গ্রামের ষণ্ডা-গুণ্ডা শ্রমিক। রাতেই চড়াও হয়ে কান্‌কে করা হলো বন্দী।

সর্ব্বসমক্ষে কম্যাণ্ডার কান্-এর বিচার হলো। তার স্বপক্ষে কেউ নাই। তার হলো প্রাণ-দণ্ড। তারপর কান্-পরিবারকে দেওয়া হলো পনর একর জমি। বাকি জমি মজুরদের ভিতর বিলি হলো। ব্যস্। অত্যাচার রহিত হলে, কান্ পরিবারও অন্য দশ জনের মত শ্রমিক জীবন যাপন কর্‌তে বাধ্য হলো। গ্রামবাসীরা তাদের পর ভাবতো না, আপন জনের মত মিলে মিশে রইলো।

মাদাম সান্ ইয়াৎ সেন

এদিকে চিয়াং কাই শেক যখন জাপানী অভিযানে কোণঠাসা হয়ে চুংকিংএর পাহাড় অঞ্চলে গিয়ে আড্ডা গাড়লেন মাদাম সান ইয়াৎ সেন, মাদাম চিংয়া

কাই শেক দু বোনে মিলে বিদেশে শফরে ও বিদেশী সাহায্যের সংগ্রহে বের হলেন। আমেরিকা ও অন্যান্য দেশ থেকে সাহায্য পাওয়া গেল, কিন্তু সকলই হাত করে নিলেন চিয়াং কাই শেক।

চীনের অতি বড় দুঃসময়েও সে সাহায্যের এক কণাও ব্যয় হলো না দেশের দুঃখ-দুর্দ্দশা মোচনে। শোচনীয় অবস্থায় পড়েও কোন চীনবাসী নরনারী বিদেশী সে রিলিফের ফলভোগী হয় নাই। দেশকর্ম্মী, জাতীয়তাবাদী—যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য দিল রক্ত, দিল যথাসর্ব্বস্ব, তারা তো চিয়াং-এর হস্তগত বিদেশী খাদ্য-বস্ত্র-অর্থ প্রভৃতির কোন রকম আশাই করতে পারে নাই।

মাদাম সান ইয়াং সেন এর প্রতিবাদ করেছিলেন। কিন্তু প্রত্যুত্তরে এল চিয়াং সরকারের হুম্‌কি। তাই মাদাম সানকেও স্বামীর মত হতে হয়েছিল পলাতক, চল্‌তে হয়েছিল সর্ব্বতোভাবে চিয়াং ও তাঁর তাঁবেদারদের এড়িয়ে।

এ সময়ে মাদাম সান প্রতিষ্ঠা করেন কাল্‌গানে (যাকে তখন কমিউনিষ্টদের দ্বিতীয় রাজধানী বলা হতো) প্রথম ইণ্টারন্যাশ্‌নাল পীস হস্‌পিট্যাল (১৯৩৭) কানাডার ডাঃ নর্ম্মান বেট্যান্ (N. Bethune) এর পরিচালনায়। কিন্তু ঔষধ-পত্র সরবরাহ অবরোধ করে কুওমিন্তাং, ফলে ডাঃ বেট্যান্ নিহত হন। তখন মাদাম সান মৃতের নামে 'চায়না ওয়েল-ফেয়ার ফণ্ড' উৎসর্গ করে এ জাতীয় আরো হাসপাতাল স্থাপন করেন। ১৯৪৬ খৃঃ অঃ মধ্যে সমুদয়ে বিয়াল্লিশটি শাখা সহ আটটি পীস্ (শান্তি) হাসপাতাল হয়েছে।

ইয়াংসি নদের উত্তর তীর পর্য্যন্ত কমিউনিষ্ট অধিকারে যাবার পরও মাদাম সান ইয়াং সেনের স্পষ্ট কথায় উত্তেজিত হয়ে কুওমিন্তাং তাঁকে গ্রেপ্তারের ভয় দেখায়। ফলে মাদাম সান কমিউনিষ্ট এলাকায় পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

আজকেকার ঘটনা পরিণতিতে মাদাম সান ইয়াং সেনকে কমিউনিষ্ট এলাকার প্রথম প্রেসিডেণ্ট রূপে যদি দেখা যায় তবুও আশ্চর্য্য হবার কিছু নাই।

অনন্ত মরণের অভিশাপ

জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই শেক

লিও চিয়াং কাই কুওমিন্তাং-এর সভ্য, বাস তাঁর ক্যাণ্টনে। জ্ঞানে গুণে পণ্ডিত লোক তিনি। তাই ডাঃ সান ইয়াং সেনের সঙ্গে জন্মে ঘনিষ্ঠতা, যে সময়ে ডাঃ সান জাপানে নির্ব্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। দেশে ফিরে দুজনে মিলে বিপ্লবকে জয়যুক্ত করবার জন্য উঠে পড়ে লেগে গেলেন। কিন্তু ডাঃ সান ইয়াং সেনের মৃত্যু হলো, তার পরেই লিও চিয়াং কাই হলেন নিহত (১৯২৫)।

প্রচার শুনতে পাওয়া যায় লিও চিয়াং কাইয়ের মত চিয়াং কাই শেকের সঙ্গেও ডাঃ সানের পরিচয় হয় জাপানে। কিন্তু ব্যাপার বাস্তবে ওরূপ নয়। নামের সাদৃশ্যে ও-রকম ভুল হয়তো হয়েছে। চিয়াং কাই শেক তখন কুওমিন্তাং সভ্য ছিলেন না।

এক অভিজাত ব্যবসায়ীর পুত্র হলেন চিয়াং কাই শেক। শিক্ষা অল্প বয়সেই ত্যাগ করে হয়ে পড়েন ফাট্‌কা বাজারের দালাল। কিছুদিন কেটে গেল, ফাটকা বাজারের প্রতি মোহ কমে এল। রাজনীতিকের যশ তাঁকে আকৃষ্ট করলো। তিনি এসে জুটলেন ডাঃ সানের পাশে।

তখন চীনের যে সামাজিক রীতিনীতি তাতে শুধু নিজ পৌরুষে রাজনীতিক বলে খ্যাতি অর্জ্জন করতে হলে অনেক কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, অনেক দুঃখ-কষ্ট বরণ করে তবে দশের ওপরের স্তরে ওঠা যায়। কিন্তু চিয়াং কাই শেক দেখলেন, যদি দেশের কোন না কোন গণ্য-মান্য ব্যক্তির পরিবার-ভুক্ত হওয়া যায়, তা হলে অগ্নি-পরীক্ষা ব্যতীতই অতি অল্পসময়ে দেশপূজ্য রাজনীতিক হতে পারা যায়—প্রয়োজন শুধু ঠিক সময়ে যোগ্য স্থানে ঘা দেবার কূটনৈতিক চাল আয়ত্তে রাখা।

বিবাহ

ডাঃ সানের সান্নিধ্য তিনি আঁকড়ে রইলেন, কিন্তু প্রখর দৃষ্টি চারিদিকে ছড়িয়ে দিলেন কোথায় পান তিনি তাঁর চির-বাঞ্ছিত জীবনের সুযোগ।

কিছুদিন মধ্যেই সে সুযোগ দেখা দিল তাঁর দিক-চক্রবালে—সুং পরিবার রূপে। পরিবারের কর্ত্তা-ব্যক্তি টি ডি সুং তেজারতী কারবারে টাকার সুদ গুনে গুনে হাতে কড়া ফেলেছেন। মাদাম সান্ ইয়াৎ সেনের অনুগ্রহে চিয়াং কাই শেকের আনাগোনা এ পরিবারে। তাঁর উচ্চাশার সোপান স্বরূপ তিনি বিবাহ করেন টি ডি সুং-এর তৃতীয় ভগ্নীকে।

মাদাম সান ইয়াৎ সেনের অঞ্চল ধরে সুং পরিবার যথেষ্ট প্রাধান্য লাভ করলো চীনে, আর সুং পরিবারের আপনজন বলে দেশবাসীর চোখে চিয়াং কাই শেক হয়ে উঠলেন জাঁদরেল রাজনীতিক।

এর পরই তিনি ডাঃ সান্ ইয়াৎ সেনের নির্দ্দেশে রুশিয়ায় যান। সেখানে তিনি বিশেষ করে দেখে এলেন রুশিয়ার মিলিটারী ট্রেনিং। অন্য কিছু দেখলেও তাঁর মনে তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারে নাই। রুশিয়ার সেনানী লৌহাঙ্গ আগ্নেয়াস্ত্রের মতই রক্ত-মাংস-গঠিত মারণাস্ত্র মাত্র নয়। তাদেরকে সমবেত গণ মতের বিরুদ্ধে স্বেচ্ছাচারী চালিত করতে পারে না। এককথায় তাদেরও মস্তিষ্ক আছে, আছে স্বাধীন চিন্তা। সবার ওপর আপন পরিবার পালনের জন্য অর্থোপার্জ্জনের আশায় ভাগ্যান্বেষণে তারা বেতনভোগী সৈন্যরূপে দলবৃদ্ধি করে নাই। তাদের যে আদর্শ তার বেদীমূলেই জীবন অর্পণ করেছে, পাশবিকতার পদে নয়।

বাহির হতে দেখে চিয়াং-এর তাক্ লেগে গেল। তিনি দেশে এসে ডাঃ সান্-এর সঙ্গে পরামর্শ করে ও-রকম মডেল (আদর্শ) পল্টন গঠন করতে লাগলেন। কিন্তু তিনি ভুলে গেলেন, এ পল্টনের মানসিক বৃত্তি উন্মেষ করতে হলে রুশদের মত মহান আদর্শের পূজারী তাদের করতে হয়, নতুবা গতানুগতিকের বেড়াজাল কাটানো সম্ভব নয়।

কিন্তু চিয়াং চান ক্ষমতা, ক্ষমতা অর্জ্জন ভিন্ন লক্ষ্য তাঁর আর কিছু নাই। তাই ফৌজের আদর্শের জন্য মাথা ঘামালেন না। তিনি সৈন্য গঠন করলেন নামে মাত্র রুশ প্রথায়—কিন্তু রুশ প্রথা মতে যে প্রাণ-প্রতিষ্ঠা সেটিরই রইলো অভাব।

প্রথম কংগ্রেস

১৯২৪ খৃঃ অঃ প্রথম জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হলো। অধিবেশনে ডাঃ সান ইয়াৎ সেন বললেন—কর্ম্মপদ্ধতি আমাদের হস্তগত, সুতরাং সাফল্য

নিশ্চিত। এ সময়ে সোভিয়েট প্রতিনিধি এডল্ জোফ ও লিও চিয়াং কাইকে নিয়ে তিনি কার্য্যরত ছিলেন। কিছুদিন পরে এলেন বরোদিন ও তাঁর দল। ডাঃ সান্ একেবারে 'বামপন্থী' হয়ে গেলেন।

চিয়াং কাই শেক নীরবে সবই লক্ষ্য করতে লাগলেন। কিন্তু অন্তরের গোপন বাসনা বর্জ্জন করে কোন দিন প্রাণ খুলে ডাঃ সান্-এর বিপ্লবের প্রয়াসকে জয়যুক্ত করতে অগ্রণী হন নাই। ক্ষমতার প্রলোভন তাঁর পায়ের বেড়ি হয়ে পদকে করলো নিশ্চল।

এমন দিনে গণতান্ত্রিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন, চীন-জাতীয়তাবাদের মূর্ত্ত-প্রতীক, গণমুক্তির উপাসক ডাঃ সান ইয়াং সেন এর প্রাণবিয়োগ হয়, দেশ তখন কতকগুলা দলে বিভক্ত। প্রথমতঃ কুওমিন্তাং তো পূর্ব্ব হতেই দুই বিরোধী দলের লীলাক্ষেত্র। ওদিকে আবার তুতুন সেনানায়কগণ প্রত্যেকেই স্ব স্ব প্রধান ও নিজের অধিকার সম্প্রসারণে চেষ্টিত। বিপ্লবীরা ডাঃ সান্ ইয়াং সেনের তিন নীতিকে নাকচ করে মার্ক্সবাদের কর্ম্মসূচী গ্রহণে আগ্রহান্বিত। কুওমিন্তাং-এর রক্ষণশীলদল নিজেদের প্রভাব বিস্তারে তৎপর—সে উদ্দেশ্যে যোগ্য নেতার অপেক্ষায় ব্যগ্র হয়ে উঠেছে।

ডাঃ সান্ ইয়াং সেনের তিন নীতি কৃষক-শ্রমিকের উন্নতি-বিধান সম্বন্ধে কোনও কর্ম্মসূচী নির্দ্ধারিত করে নাই, কিন্তু মার্ক্সবাদে তাকেই দেওয়া হয়েছে প্রথম স্থান। চীনের বামপন্থীরা তাই ডাঃ সান্-এর ত্রি-নীতি অসম্পূর্ণ জ্ঞানেই বর্জ্জন করতে বদ্ধপরিকর হলো। আর সেই দৃষ্টিতে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য বিপ্লবের পথ অবলম্বন করলো।

বিপ্লবীর অপহ্নব

চিয়াং কাই শেক তখনই এগিয়ে এসে রক্ষণশীলদের মুখপাত্র হয়ে ডাঃ সান্-এর জাতীয়তাবাদের জিগীর তুলে বিপ্লবীদের দিলেন বাধা। কুওমিন্তাং-এর সভা বসলো (১৯২৬)। সভায় অনেক প্রস্তাব গৃহীত হলো। দ্বিতীয় ধারাটি বিপ্লবীদের আশা-আকাঙ্ক্ষা চূর্ণ করে দিল।

If the members of any other party wished to join the Kuomintang, that other party shall instruct its members that the basic principles of the Kuomintang are contained in the

three principles formulated by Dr. Sun Yat-Sen: and that they shall not entertain any doubt on, or criticise Dr. Sun or his principles.

'অপর কোনও দল যদি কুওমিন্তাং-এ যোগ দান করে তবে তাদের স্বীকার করে নিতে হবে যে কুওমিন্তাং-এর মূলনীতি ডাঃ সান্-এর ত্রি-নীতিতে সন্নিবিষ্ট: আরও যে সে ত্রি-নীতি বা ডাঃ সান্ সম্বন্ধে কোন প্রকার সন্দেহ-পোষণ বা বিরূপ সমালোচনা যোগদানকারী দল কিছুতেই করতে পারবে না।'

আর এ ধারা বজায় রাখ্‌তে কিরূপ কঠোরতা অবলম্বন করা হবে, তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেশবাসীর সম্মুখে উপস্থিত করা হলো সহসা কতকগুলা (শতাধিক) নৌ-সেনানায়ক গ্রেপ্তার দ্বারা।

১৯২০ খৃঃ অঃ কমিউনিষ্ট পার্টি গঠিত হবার পর হতে তারাই বিপ্লবী! চিয়াং কাই শেকের দৃষ্টিতে তাদের স্পর্শে কুওমিন্তাং কলুষিত। সুতরাং কমিউনিষ্টদের নামগন্ধও লুপ্ত করতে হবে কুওমিন্তাং থেকে, কোন প্রকার ক্ষমতা লাভের সুযোগ থেকে।

নৌ-সেনা আটক হলো কমিউনিষ্ট সন্দেহে। কিন্তু বহু অনুসন্ধানেও উহাদের কমিউনিষ্ট মনোবৃত্তি প্রমাণিত হলো না, কমিউনিষ্ট পার্টির সঙ্গে কোন সংশ্রব আবিষ্কার করাও গেল না। উহাদের মুক্তি দেওয়া হলো। কমিউনিষ্ট-পার্টি কুওমিন্তাং ত্যাগ কর্‌লে কোন অধিকারই পেতে পারে না মনে ক'রে আপাততঃ শান্তিপূর্ণ উপায়ের পথিক হলো, কুওমিন্তাং-এর প্রস্তাব স্বীকার করে নিল। কিন্তু প্রস্তাবটি যে কমিউনিষ্ট দমনের মূল অস্ত্র তা ভেবে দেখলো না। কাজেই এবার দেশ এক-নায়কত্বের দিকে এগিয়ে চল্‌লো, যে লক্ষ্য নিয়ে চিয়াং কাই শেক রক্ষণশীলদের দলাধিপতি হয়েছেন।

গণতন্ত্রে এক-নায়কত্বের স্থান হতে পারে না। কিন্তু যেখানে দেশের ভিতরে থাকে রাজনৈতিক বিভিন্ন দল, সেখানে সংখ্যা-লঘিষ্ঠ একটি মাত্র দল যদি রাষ্ট্রের সকল অধিকার আয়ত্ত করে নেয়, তবেই একজন সর্ব্বনিয়ন্তা দেখা দেন। বস্তুতঃ সেই সর্ব্বনিয়ন্তার প্রভাবেই দলটি দেশমধ্যে প্রাধান্য বিস্তার করে।

এক-নায়কত্ব, মাইনরিটি হয়ে মেজরিটির ওপর স্বেচ্ছাচার চালানো—সবই দূর হতে পারে জাগ্রত জনমতের কশাঘাতে, সে অবস্থার উদ্ভব কর্‌তে হলে চাই জনগণের অর্থনৈতিক মুক্তি, স্বাধীন চিন্তার উন্মেষ ও তদুপযোগী শিক্ষালাভ।

এক-নায়কত্বকে কিছুটা খর্ব্ব করে তবু গণতন্ত্রের কথঞ্চিৎ মর্য্যাদা রক্ষা করতে পেরেছে ব্রিটেন। নইলে পুঁজিবাদের আওতায় পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই সর্ব্বাধিনায়কের প্রত্যক্ষ প্রভাব। অবশ্য সোভিয়েটের কথা বাদ দিলে।

প্রধান সেনাপতি

কুওমিন্টাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করেই কমিউনিষ্ট পার্টি কাজ করে যেতে লাগ্‌লো। এবার চিয়াং কাই শেক নিযুক্ত হলেন কম্যাণ্ডার-ইন-চীফ (প্রধান সেনাপতি)। দক্ষিণপন্থীরা তাঁকে এ ক্ষমতা দিল, কাজেই বামপন্থীদের প্রভাব আরো অস্বীকৃত হলো।

কুওমিন্টাং দক্ষিণপন্থীদের হেড কোয়ার্টারস ছিল নানচাংয়ে। বাম-পন্থীদের প্রধান আড্ডা উহান। তাদের ভিতর ডাঃ সান্‌-য়ের সময় থেকেই প্রবল প্রতি-যোগিতা, সে কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। আজও সে বিরোধিতার প্রকোপ একটুও কমে নাই।

দল হিসাবে কমিউনিষ্টদের পৃথক সত্তা একেবারে লুপ্ত করবার জন্য চিয়াং কাই শেক এক সভা ডাকলেন। অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে সে সভায় প্রস্তাব গৃহীত হলো—থার্ড ইণ্টারন্যাশনেল হতে তিনজন সভ্যকে আহ্বান করে চীনের সকল দলের একযোগে মিলিত কার্য্যসূচী প্রণয়ন করা হোক—যাতে সত্বর দেশের উন্নতি সর্ব্বতোমুখী হতে পারে। দক্ষিণপন্থীরা নানচাং থেকে হেড কোয়ার্টারস নিয়ে এল নান্‌কিনে, সমগ্র চীনের হেড কোয়ার্টারস নির্দ্দিষ্ট হলো নানকিন—সেকালের মিং রাজবংশের রাজধানী।

এ সময় থেকেই কমিউনিষ্টদের গোপনে নির্ম্মূল করণ সুরু হলো প্রবলভাবে। এ জন্য গোয়েন্দা, গুপ্ত পুলিশ নিযুক্ত হলো। শুধু নান্‌কিন শহরে নয় যে সকল স্থানে নানকিনের প্রভাব-প্রতিপত্তি বেশি সেখানেই চল্‌লো এ হত্যা। গোপন সন্ধানে ধৃত হলেও হত্যা হতো প্রকাশ্যে ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতি মিথ্যা অভিযোগের সাহায্যে। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের মুখপত্র এরূপ সংবাদ ক্রমাগত প্রকাশ করছিল—ডাকাত, ব্যাণ্ডিট্‌-দলের উচ্ছেদ সাধন বলে।

ফলে অনেক আমেরিকান্‌ ও ইউরোপিয়ান্‌ পর্য্যন্ত এরূপ ডাকাত-হত্যার জন্য শাসন-ব্যবস্থার দোষারোপ করতো—কারণ শাসনের সুব্যবস্থা থাকলে ডাকাতের উদ্ভব হতে পারে না; তার পর শাসকগণের ত্রুটি যে তারা কারাগারে আটক না

রেখে করছে প্রাণনাশ। প্রকৃত কারণ তাদের জানিত নয়, তাই এরূপ মনে করতো।

আমিও একদিন একথা মনে করতাম, কিন্তু চীনে পদার্পণ করে আমার ভুল ভেঙ্গেছে।

কমিউনিষ্ট পার্টি নীরবেই এ অত্যাচার সহ্য করতো দুটি কারণে। একটি হল সমগ্র দেশের একীকরণ ও দ্বিতীয়—সামন্ত-প্রভু (war-lords)দের দমন করা। তবু কমিউনিষ্ট পার্টির ভিতরও একদল ছিল যারা পার্টির এ মত সমর্থন করতো না। তারা অত্যাচার ও দক্ষিণপন্থীদের প্রভুত্ব—দু'য়েরই ছিল বিরোধী। নরমপন্থীদল সংস্কারকামী, আর তাদের মত-বিরোধীদল বিপ্লবী। এ মতান্তরের ফলেই মাও সে তুন্‌কে সংস্কারকামীরা কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে করেন নিষ্কাশন।

উত্তর চীনে চলেছে কমিউনিষ্ট সংহারের অভিযান। এতে দক্ষিণপন্থীরা চিয়াংয়ের সহায়ক। তখনও কমিউনিষ্টরা বামপন্থীদের সহকর্ম্মী। কিন্তু এর পর এল আরো ভীষণ সংবাদ। হুনান প্রদেশের এক বিখ্যাত সেনাধ্যক্ষ তাং সেন চি, আড্ডা তার চাংসা। কমিউনিষ্টদের সঙ্গে তার বিবাদ হয়, ফলে হলো প্রত্যক্ষ সংঘর্ষ। সেনাধ্যক্ষের আদেশে বহু কমিউনিষ্টকে নিহত করা হলো (১৯২৭)।

এ সংবাদ উহানে পৌছলে অভিযোগ উপস্থিত করা হয়। কুওমিন্তাং তদন্ত ও বিচারের ভার দিলেন সেই তাং সেন চি'র ওপর, যার বিরুদ্ধেই এ অভিযোগ।

সেদিন কমিউনিষ্ট পার্টি পরিষ্কার দেখতে পেল, আর যদি তারা কুওমিন্তাং-য়ের বামপন্থীদের সহায়ক হয়ে এখনও কুওমিন্তাং-এ থাকে, তবে কুওমিন্তাং-এর দক্ষিণপন্থী ও বামপন্থী উভয়ে মিলে কমিউনিষ্টদের দেবে চিয়াং কাই শেকের হাতে তুলে একেবারে নির্ম্মূল করবার জন্যে। তাই বিপ্লবী কমিউনিষ্টরা ইস্তাহার জারি করলো—কুওমিন্তাং বামপন্থীর সঙ্গে আর সহযোগিতা করা চলে না, তারা কমিউনিষ্ট পার্টিকে প্রতারণা করেছে।

প্রেসিডেন্ট

কমিউনিষ্টদের এ আত্মকলহের সুযোগে তাদের অস্বীকার করে সমগ্র কুওমিন্তাং-এর সমর্থনে ও দক্ষিণপন্থীদের গোপন ব্যবস্থায় ১৯২৮ খৃঃ অঃ ৯ই

অক্টোবর জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই শেক প্রেসিডেণ্ট পদে মনোনীত হলেন। সর্ব্বসম্মতি থাকায় সে মনোনয়নই নির্ব্বাচনের মহিমা প্রাপ্ত হলো। এতকাল পরে ফাট্‌কা বাজারের দালালের জীবনের উচ্চাশা বাস্তবে পরিণত হলো।

প্রেসিডেণ্ট পদে আরোহণ করেই চিয়াং কাই শেক উত্তর চীনের কমিউনিষ্ট বিনাশ সত্বর সমাধা করবার দিকে অগ্রসর হলেন। দিন দিন তাঁর প্রতাপ বেড়েই চল্‌লো। প্রেসিডেণ্টের পদকে তিনি স্বেচ্ছাচার সম্রাটের মশ্‌নদই মনে করে নিলেন।

কাজেই একদিকে তিনি দুর্ব্বার গতিতে সুরু করলেন কমিউনিষ্ট দলন, অপর দিকে তেমনই ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের ত্রি-নীতির করলেন কণ্ঠরোধ। অথচ ডাঃ সান্‌-এর জাতীয়তাবাদের দোহাই দিয়েই বিরোধীদের করেছিলেন কুওমিন্তাং-এ শক্তিহীন। কৃষকদের জমিদান রইলো ধামাচাপা, কারণ চিয়াং কাই শেক দেশীয় ধনিক শ্রেণীর নাচের পুতুলে পরিণত হলেন। তিনি যা করে চললেন তাতে জনগণের আশা পূর্ণ হলো না, বরং তার উল্‌টা পথেই পা বাড়ালেন।

কুওমিন্তাং-এর এ সকল প্রগতি ও বিপ্লব বিরোধী কার্য্যকে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী সানন্দে অভিনন্দিত করলো। দেশীয় ধনিক শ্রেণী আর বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের অভিভাবকত্বে চিয়াং কাই শেক মনে করলেন তাঁর মশ্‌নদ নিষ্কণ্টক।

কিন্তু নির্য্যাতিত গণশক্তি নতুন পর্য্যায়ের অবতারণা করলো, তারই প্রচণ্ড ধাক্কায় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর কুওমিন্তাং সরকারকে একেবারে আমেরিকার সামন্ত-সর্দ্দারে রূপান্তরিত করে ফেল্‌লো। এ কথা কারু জানতে বাকি নাই যে, জাতিগত সাম্য সাধনের জন্য এট্‌লাণ্টিক চার্টার রচিত হলেও এশিয়ার জাতিগুলাকে তা থেকে বাদ দেওয়া হলো। কাজেই চীনে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেওয়া বিচিত্র নয়।

নতুন পর্য্যায়ের সেনা

কুওমিন্তাং-বামপন্থীদের যে সমর্থন ছিল তারই আওতায় মনের বল পেয়ে বিপ্লবী কমিউনিষ্ট চমৎকার এক সামরিক বাহিনী গঠন করতে লাগলো। সে সেনাবাহিনী গঠিত হলো কুওমিন্তাং-যের প্রভাব-প্রতিপত্তির বাইরে। সেদিনে উভয় দলের ছিল সহযোগিতা। আজকের নেতা মাও সে তুন

সেদিন ছিলেন কুওমিন্তাং কমিউনিষ্ট সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের প্রচার দপ্তরের সর্ব্বপ্রধান পরিচালক। আর সেই সম্মিলিত প্রতিষ্ঠানের তরফে যোগ্য সেনা-সংগঠন কর্ত্তা ছিলেন আজকেকার চৌ এন লাই, একথা আগেই বলা হয়েছে।

এদের অভিযান দেখতে পাওয়া গিয়েছিল ১৯২৫-১৯২৭ খৃঃ অঃ উত্তর চীনে, যে সময় উভয় দলের মিলিত চেষ্টা বিদেশী বিতাড়নের নির্ভয় নিনাদকে প্রতিধ্বনিত করেছিল। তারা সাংহাই নগরের অদূরে পৌছালো। বিরাট মজুর দল সেখানে গড়ে তুলেছিল মিলিশিয়া সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিরোধের জন্য, সংবাদ পেয়ে তারা এসে যোগ দিল অভিযানকারী দলের সঙ্গে।

ব্রিটেন, ফ্রান্স আর মার্কিন্ অভিযাত্রী বাহিনীকে বাধাদান করতে চিয়াং কাই শেকের হাতে ফৌজ কিছু কিছু দিল, কিন্তু সরাসরি প্রকাশ্য যুদ্ধে নামলো না। কারণ আমেরিকান্ সরকার যুদ্ধের তেমন পক্ষপাতী ছিল না, যুদ্ধ এড়াতেই চেয়েছিল। তাই নির্দ্দেশ দিয়েছিল বিদেশীদের স্বার্থ হানি না হওয়া পর্য্যন্ত যুদ্ধে কেউ লিপ্ত হবে না। তথাপি এর ফলে দেখা যায় (১৯২৬) ইংরেজ আর মার্কিন নৌ-বহরের নান্‌কিন্ শহরের ওপর গোলাবর্ষণ।

চীনের যুদ্ধোত্তর রূপটি যখন উত্তর চীনে ফুটে উঠ্‌লো, চিয়াং কাই শেক অনেক চেষ্টাই করেছিলেন তাদের সঙ্গে মিতালী করতে। কিন্তু লক্ষ্য যেখানে বিপরীত, মিলন সেখানে ভাঙ্গনের সমান। তাই চিয়াং-বিরোধী শক্তি সন্ধি-সর্ত্ত আলোচনায় সময়-পাত করেছে প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করতে, নইলে সন্ধি যে অসম্ভব তা তারা নিশ্চিত জান্‌তো, মুখে প্রকাশ করে নাই।

চৌ এন্ লাই

ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের মৃত্যুর পর যে নতুন পর্য্যায়ের সেনা-বাহিনী গঠিত হয়, তার মূলে ছিল পাশ্চাত্য সামরিক শিক্ষায় পারদর্শী চৌ এন লাই-এর পরিকল্পনা ও সংগঠন। তবু তিনি কিন্তু সর্ব্বহারার বংশধর ছিলেন না।

চীন দেশে লোকে শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে দু' উপায়ে—এক অর্থে, দ্বিতীয় বিদ্যায়। চৌ এন লাই এর পিতা ছিলেন, রাজবংশের শিক্ষক। পুঁজিপতি না হলেও অভাব তাঁর সংসারে ছিল না।

চৌ এন লাই তাই পিতার যোগ্য-পুত্র হলেন লক্ষ শব্দের মূলধন সংগ্রহ করে, চীনা ভাষায় পণ্ডিত বলে পিতার ন্যায় খ্যাতি অর্জ্জন তাঁর পক্ষেও সম্ভব হলো।

বিদ্যারও একটা আভিজাত্য আছে নিশ্চয়, যেমন দেখা যায় ভারতের শিক্ষিত ভদ্রলোকদের ভিতর। তাঁরা নেংটি পরে বেমালুম শ্রমিকদলে মিশে যেতে পারেন না। চৌ এন লাইয়েরও তেমনি একটা সঙ্কোচ ছিল। তথাপি তিনি যে রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়ে চিয়াং কাই শেকের মত সুবিধাবাদের পূজারী হন নাই এটা প্রশংসার বিষয়।

তিনি সামান্য রাজনীতি চর্চ্চা করেই বুঝলেন, একটা বিদেশী ভাষা ভাল করে আয়ত্ত না করলে সুবিধা নাই, কারণ নতুন ভাবধারা সমস্তই পাশ্চাত্যের আবিষ্কার। তাই তিনি ইংরেজী শিখবার জন্য টিয়েন্‌সিনে মিশনারী পরিচালিত নানকাই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্ত্তি হন।

কারাদণ্ড

আমেরিকান মিশনারীদের শিক্ষকতায় তিন বৎসরে তিনি যথেষ্ট ইংরেজী পুস্তক পড়ে ভাষার ওপর দখল লাভ করেন। এ সময়ে জাপানীরা তাদের একুশ দফা সর্ত্ত মেনে নিতে চীনের ওপর চাপ দেয় (১৯১৯); ওদিকে প্রেসিডেণ্ট ইউয়েন সি কাই সম্রাট হবার জন্য বিপুল চেষ্টা করেন। ছাত্র সমাজ বিদ্রোহ উপস্থিত করে। টিয়েনসিনে ছাত্র-নেতা হন চৌ এন লাই।

নির্ম্মমতার সঙ্গেই বিদ্রোহ দমিত হয়। চৌ এন লাই ধৃত হয়ে এক বৎসরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। কারাগারে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এক কমিউনিষ্ট তরুণীর সঙ্গে। মুক্তিলাভের পর তরুণীর প্রেরণায় তিনি ফরাসী দেশে যেয়ে প্রবাসী চীনা কমিউনিষ্ট দলে যোগদান করেন।

পিকিনের চিলি রোডে স্থাপিত (১৯২০) পাঠ-চক্রকে তিনি নানাভাবে সাহায্য করেন, তাঁর প্রধান কাজ হলো কমিউনিষ্ট সাহিত্য চীন ভাষায় তর্‌জমা করে ওখানে পাঠিয়ে দেওয়া। দু' বছর প্যারীতে থেকে এ কাজ করে তিনি লণ্ডনে যান, কিন্তু চীনা বিশ্বাসঘাতকের দল তাঁকে অতিষ্ঠ করে তোলে, কারণ তখন তিনি ইউরোপ-খণ্ডে বিপ্লবী কর্ম্মবীর বলে চিহ্নিত।

আবার প্যারীতে ফিরে এসে সেদেশের মিলিটারী ট্রেনিং গ্রহণ করেন এক বৎসর, তার পরে যান জার্ম্মানী। সেখানেও জার্ম্মান্ কমিউনিষ্টদের সঙ্গে মিশে আর এক বৎসর সামরিক শিক্ষা প্রাপ্ত হয়ে দেশে ফিরেন (১৯২৪)।

তাঁর প্রথম কাজ হয় ডাঃ সান ইয়াৎ সেনের ক্যাণ্টন-দলে যোগদান। সে হলো ডাঃ সানের সর্ব্বশেষ গণ-বিপ্লব উত্থাপনের সময়। চৌ এন লাইয়ের বয়স তখন মাত্র ছাব্বিশ বছর। কিন্তু শিক্ষিত চীনা মহলে, রাজনীতিক সংঘে তিনি গণ্য-মান্য নেতৃস্থানীয়। তাই হোয়ান্ পোয়া একাডেমির সেক্রেটারীর পদে নিযুক্ত হতে তাঁকে বেগ পেতে হয় নাই। সেখানে প্রধান পরিচালক সোভিয়েট রুশিয়ার ব্লুচারের চতুর উপদেশে তিনি হাতে কলমে শিক্ষা পান চীনদেশের অবস্থানুযায়ী সাম্যবাদের গণ্ডি গড়ে তুল্‌তে।

কিন্তু চিয়াং কাই শেকের খরদৃষ্টি তাঁর ওপর পতিত হয়। চিয়াং হলেন হোয়ান্ পোয়া একাডেমির প্রেসিডেণ্ট। তাঁর আশঙ্কা হলো চৌ এন লাইকে প্রলুব্ধ করে কাজ বাগানো যাবে না প্রয়োজন দেখা দিলে। তাই সর্ব্বপ্রকারে চৌ এন লাই-য়ের সেক্রেটারী পদের চারিদিকে উত্তপ্ত আবহাওয়া সৃষ্টি করলেন।

সামরিক সংগঠন

এ সময়ে কুওমিন্তাং বামপন্থী ও কমিউনিষ্টরা একযোগে কার্য্যরত। আশান্বিত হয়ে লাই এলেন সাংহাই সেক্রেটারী-পদ ত্যাগ করে। তিন মাসের মধ্যেই দেখা দিল ছয়লক্ষ শ্রমিকের সাধারণ ধর্ম্মঘট। বিদেশী সাম্রাজ্যবাদের পুলিশ ষ্টেশন, অস্ত্রাগার প্রভৃতি দখল করা গেল না।

বিফল হয়ে লাই এবার মন দিলেন, অশস্ত্র হয়েও কি করে শস্ত্রধারী বিপক্ষ হতে অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়া যায়, রীতিমত লড়াই করা যায়, সে শিক্ষা অশিক্ষিত মজুরদের দিতে। কারণ ও-শিক্ষার অভাবেই ধর্ম্মঘটীরা সংখ্যায় শতগুণ হয়েও পরাস্ত হয়েছে। সাংহাইয়ের লিডার চো সে ইয়েন, কো সান চেং, লো ই মিং—এদের সাহায্যে তিনি ফরাসী কন্‌স্যেশনে গোপনে পঞ্চাশ হাজার ক্যাডেটের শিক্ষাদানে ব্রতী হন। আবার তিনি তখন মিলিত কুওমিন্তাং কমিউনিষ্ট পার্টির সামরিক সংগঠক।

১৯২৭ এল। আবার সাধারণ ধর্ম্মঘট। আবার মজুর সমাবেশ লক্ষ লক্ষ। এবার চৌ এন লাইয়ের শিক্ষা-কৌশলে পুলিশ ষ্টেশনগুলা তো সহজেই অধিকার হলো, অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হলো, তারপরে হলো উজাং কেল্লা দখল। দেশবাসী আশার আশায় বিপ্লবী দলের প্রতি দরদের দৃষ্টি দিল।

কিন্তু এক ধূমকেতুর উদয়ে কয় মাস মধ্যেই বিপ্লবের এ বিরাট সম্ভাব্যতা নিঃশেষে অন্তর্হিত হলো। জেনারেল চিয়াং কাই শেক কুওমিন্তাং-বন্ধু কমিউনিষ্টদের সাহায্যে সাংহাইতে নিরাপদে প্রবেশ ক'রে প্রেসিডেন্টের মশনদ পাকড়াও ক'রে স্বরূপ প্রকাশ করলেন।

এ পদে আসীন হবার পথে চিয়াং-য়ের নিজস্ব কোন অবদান ছিল না। তৈরি এ মশনদে যেন তাঁকে কোলে করে এনে বসিয়ে দেওয়া হলো। প্রথম পুরস্কার চিয়াং দিলেন তাদের যারা করলো তাঁর সাংহাই প্রবেশের পথ পরিষ্কার, সে রক্তাক্ত পুরস্কার হলো শিরশ্ছেদ।

চৌ এন্ লাই আর তাঁর সহকর্ম্মী অনেকে আটক হলেন। কঠোর আদেশ, এদের হবে প্রাণদণ্ড। কিন্তু নিশীথ রাতে কে একজন জাঁদরেল সেনানায়ক এসে গোপনে লাইকে করলো পরিত্রাণ। এ সেনানায়ক লাই-য়েরই ছাত্র আর সরকারী জঙ্গী অফিসার হলেও বিপ্লবীদের বন্ধু।

আটক সহকর্ম্মীদের কোতল করা হলো। দেশময় বিভীষিকার সঞ্চার হলো। গুপ্ত সন্ধানী-গোয়েন্দার কারসাজি হলো অব্যাহত। চৌ এন লাই তো পলায়ন করেছেন। তার পরই সমগ্র দক্ষিণ মুলুক হতে যত সব সমর-নেতা একে একে উত্তরের স্ব এলাকায় গিয়ে গা-ঢাকা দিয়ে রইলো।

দৌত্য-কার্য্য

চৌ এন লাই প্রাণ নিয়ে পালিয়ে চালিন সোভিয়েটে যেয়ে চু তে আর মাও সে তুনের দলে যোগ দেন। এর পরে দেখা যায় পণ্ডিত চৌ এন লাই কেবলই করছেন দৌত্য কার্য্য। কারণ বোধহয় তাঁর অসীম বিদ্যাবত্তা, তাঁর মত ধীর স্থির অথচ বাক্‌পটু ব্যক্তি এ দলে কমই ছিল।

চিয়াং স্যুয়ে লিয়াং যখন চিয়াং কাইশেককে বন্দী করে, তখন কমিউনিষ্টদের তরফের দূত হন চৌ এন্ লাই। কিন্তু চিয়াংকে স্বমতে আনতে পারেন নাই। আবার জাপানী-অভিযানের সময় যে চিয়াং-য়ের বুদ্ধি ফিরে সেখানেও চৌ এন্ লাই, তবে সেখানে ছিল চিয়াং-য়ের তৃতীয় উদ্দেশ্য। আবার মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে কুওমিন্তাং ও কমিউনিষ্টে সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে যে দৌত্য, সেও চৌ এন লাই চালিত।

নব জীবনের বিজয়-মন্ত্র

মাও সে তুন্

মাও সে তুন্-এর জীবন আরম্ভ আর দশজনের মতোই—গৈ-গাঁয়ে। সে ছিল হুনান প্রদেশ। মাও-য়ের পিতা সৈনিকের চাক্‌রি করেও সামান্য কয়েক খণ্ড জমি কিনেছিলেন। সৈনিকও ভূমিহীন চাষীর ছেলে, কাজেই কৃষির প্রতি আকর্ষণ তাঁর স্বাভাবিক। আর এমনি পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে মাও সে তুন্ কৃষকদের দুঃখ-দুর্গতি ভালো করে বুঝেছেন। সে জন্যই সম্ভব হয়েছিল পরে তাঁর পক্ষে কৃষক-আন্দোলনে যোগ দেওয়া।

জমিদারদের তরফে ভাড়াটে সেনাপতিরা একে-অন্যে যুদ্ধ-বিগ্রহ নিয়ে ব্যাপৃত ; প্রজার ওপর, চাষীর ওপর চলেছিল নির্ম্মম শোষণ-শাসন। মাও চাংসা গিয়ে দেখলেন, সাধারণের জীবন ও যথাসর্ব্বস্ব নিরাপদ নয় আদপেই। তবু তাঁর চোখে চাংসা সুন্দর শহর বলে বিশেষত্ব লাভ করে। কুলি-টাউন চাংসা যাঁর দৃষ্টিতে হীরার টুক্‌রা সে যে কি রকম রিক্ততার আবেষ্টনে মানুষ, আশা করি, তা আর কাউকে বেশি করে বলে দিতে হবে না।

সর্ব্বপ্রথম তিনি যোগদান করেন কুওমিন্তাং দলে, কারণ ডাঃ সানের কর্ম্মসূচী তাঁকে করেছিল আকর্ষণ। কিন্তু কিছুদিনের ভিতরই তিনি বুঝলেন, আদর্শ মহৎ হলেও সমর-নেতা ধনিক-দলের বিরোধিতায় ডাঃ সানের কর্ম্মসূচী বাধা পাচ্ছে। এ সময় তিনি আবার পড়া-শুনার দিকে ঝুঁকে পড়েন।

অবশেষে যে দিন ডাঃ সান বিরোধী দলের অপকার্য্যে ক্যাণ্টন হতে বিদায় নেন, সে দিন মাও হলেন মর্ম্মাহত। কিন্তু চুপ করে রইলেন না। ছাত্রদের ভিতর হতে স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী সংগ্রহ কর্‌লেন—ডাঃ সানের পক্ষ নিয়ে ধনিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করতে।

কিন্তু ডাঃ সান ছিলেন ত্যাগী পুরুষ, তিনি ক্রমাগত বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে আপোষ করে চল্‌লেন, পাছে চীনের একতা ক্ষুণ্ণ হয় এই লক্ষ্যে। এ দুর্ব্বলতা, এ অপরিপক্কতাই তাঁর অগ্রগতির পরিপন্থী, এ সত্য উপলব্ধি করে মাও সেদিন স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ভেঙ্গে দিয়ে পল্লীভ্রমণে বাহির হন।

গ্রামে গ্রামে ঘুরে বেড়ান, চাষীদের ভিতর মিশে যান প্রাণ খুলে আর তাদের রিক্ত উপায়হীন অবস্থার প্রতি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, দেন তাদের দুঃখ-মোচনের পথ-নির্দ্দেশ। এ সময়ে জলে ভিজে রোদে পুড়ে তাঁকে পথ চল্‌তে হয়েছে। তবু তিনি ধৈর্য্যহারা হন নাই। আপন অন্তরের সঙ্গে রসিকতা করেছেন এই বলে যে, বৃষ্টি তাঁর বরফ-স্নান (Ice-bath), রোদ হল আর্দ্রতা-মোচন (Sun-bath)।

এমনিভাবে পাঁচটি প্রদেশে প্রচার চালিয়ে তিনি উপস্থিত হন পিকিনে। এ শহরে কখনো বিশ্ববিদ্যালয়ে কখনো অন্যত্র মামুলি চাকুরি করে কাটান, কিন্তু সব সময়ই তাঁর লক্ষ্য থাকে গণ-সংযোগ। এর পর হাজির হলেন সাংহাই। তখন সাংহাই শহরে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। সাংহাইয়ের অগণিত মজুর-দল যেন আগ্নেয়-গিরি।

দ্বিতীয় কংগ্রেস

কুওমিন্তাং উপায়ান্তর না দেখে দ্বিতীয় কংগ্রেসের ব্যবস্থা কর্‌লো। বিপুল বক্তৃতা ও হর্ষধ্বনি-হাততালির মধ্যে প্রস্তাব গৃহীত হলো—ভূমিহীন চাষীদের জমি দেওয়া হবে। অথচ জমিদার ধনিক এরাও থাক্‌বে। এদের গায়ে কেউ হাত দেবে না। পরস্পর-বিরোধী নীতির এ যে গোঁজামিল। ধনিক ও শ্রমিক—এ দুটি সমান্তরাল রেখার বাস্তব মিলন সম্ভব নয়।

কাজেই সাংহাই নগরীতে কয়েক মাস কাটিয়ে মাও সে তুন ফিরে এলেন তাঁর সাধের চাংসা নগরে। এবার তিনি সংবাদপত্র সম্পাদনায় মন দিলেন। তাঁর এ কাজ করবার মতো বিদ্যাবুদ্ধির অভাব ছিল না। চীনের রাষ্ট্র অতি দুর্ব্বল, স্ব স্ব প্রধান জমিদার আর সেনাপতিরা যেন রাষ্ট্র-শক্তি বণ্টন করে নিয়েছে। এদিকে শ্রমিক কর্ম্মঠ, শ্রমিক মিথ্যা মাৎসর্য্যের বাহক নয়। সুতরাং গণ-বিপ্লবকে ঠিক পথে চালিত কর্‌তে হলে পশ্চাতে চাই সংবাদ-পত্রের নীতি-নির্দ্দেশ, যার সাহায্যে জনগণ মত ও পথ বেছে নেবে। চীনের শ্রমিক-ক্ষেত্র এখনও কাঁচা, তাদের সমুখে সর্ব্বদা জাগরূক রাখ্‌তে হবে বিপ্লবী দৃষ্টি।

এ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি চাংসায় সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র প্রকাশ করলেন। সাপ্তাহিক পত্র পুরাতন হয় না, রাজনৈতিক পুস্তকের মতোই ব্যবহার করা চল্‌বে। কিন্তু এ পত্র হতে আয়ের আশা নাই, কারণ কোন ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এ ধরণের

পত্রে বিজ্ঞাপন দেয় না। পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞাপনের টাকাটাই মোটা লাভ, নতুবা শুধু কাগজ বিক্রি দ্বারা সংবাদ-পত্র লাভবান হয় না।

সংবাদপত্রে প্রবন্ধ লিখেই তিনি কর্ত্তব্য শেষ করেন নাই। অবসর সময়ে কৃষি-মজুর ও চাষীদের সঙ্গে রাখতেন যোগাযোগ। যে বিপ্লবের বীজ বপন করা হয়েছে, তার অঙ্কুর-বিকাশের যোগ্য আবহাওয়া সৃষ্টি করতে।

১৯২৭ খৃঃ অব্দের প্রথম ভাগে হুপে, কিয়াংসি ও ফুকিন প্রদেশে চাষী ও কৃষি-মজুরদের ভিতর বিপ্লব দেখা দেয়। কুওমিন্তাং-য়ের কেউ এমন কি সেদিনের কমিউনিষ্ট পর্য্যন্ত কৃষি-বিপ্লব পছন্দ করে নাই। বিপ্লব ধূমায়িত হলেই তারা কংগ্রেসের মুখে প্রচার করলো চাষীকে জমি দেওয়া হবে, কিন্তু চাষীরা যেমনই দাবী করলো জমি, অমনি সে ব্যবস্থা না করে, সকল দোষ দেওয়া হলো মাও সে তুন-এর ওপর যে তিনিই চাষীদের এ দুষ্টবুদ্ধি দিয়েছেন। কমিউনিষ্ট দলপতি তু সিন্ কুওমিন্তাং দক্ষিণপন্থীদের সুরে সুর মিলিয়ে মাও সে তুন্'কে বিপ্লবের জন্য দায়ী করলেন। হুনান প্রদেশ হতে মাও সে তুন'কে বিতাড়িত করা হলো।

বিপ্লব-সূচনায় চিয়াং কাই শেক তথা কুওমিন্তাং ভীত হয়ে পড়লেন। কুওমিন্তাং-বামপন্থী ও কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা হলো। নানকিন, সাংহাই, ক্যান্টনে শ্রমিকদের ওপর নিদারুণ অত্যাচার চল্‌লো। নরহত্যার নিষ্ঠুরতায় চিয়াং কাই শেক সরকার চেঙ্গিস খাঁকেও ছাড়িয়ে গেল।

ক্যান্টন ভ্রমণকালে অনেকের মুখে সে বিভীষিকাময় বৃত্তান্ত শুনেছি। স্বচক্ষেও অনেক কিছু দেখেছি। মিষ্টার মার্চেন্ট নামে একটি ভারতীয় ব্যবসায়ীর দেখা পাই। তিনি করতেন চিনির কারবার। সরকারী অত্যাচারে তাঁর কারবার হয়েছে বন্ধ। শোকে-দুঃখে তিনি অর্দ্ধ-মৃত।

নান্‌কিনের ঘটনা হাংকোতে শুনেছি। সাংহাইতে যে সব ঘটনা তখনো দেখেছি তাতেই অনুমান করতে পেরেছিলাম পাঁচ-ছ বছর আগে কি তাণ্ডব ঘটে গেছে সে শহরে।

শুধু শ্রমিকদের রক্তে যে চীন রঞ্জিত হয়েছিল এমন নয়। যে সকল স্থানে কৃষক-আন্দোলন আরম্ভ হয়েছিল, সে সব স্থানের কৃষকদেরও নির্ম্মম নিষ্পেষণ চল্‌লো বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য চীনে। বহু চাষী ও মজুর গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে গেল। যে সকল ছাত্র-ছাত্রী ও শিক্ষিত সম্প্রদায় কৃষকদের ভিতর করছিল সংগঠন, তাদেরও প্রাণ নাশ করা হলো।

এ অত্যাচারে নিষ্পিষ্ট ও ভয়াতুররা যেমন গ্রাম ত্যাগ করলো, তেমনি আবার বহু গ্রামবাসী ভাবী নিপীড়নের আশঙ্কায় করলো সপরিবারে গৃহত্যাগ। কাজেই চীনে চল্‌লো প্রতিনিয়ত বাস্তুত্যাগের হিড়িক। দলে দলে লোক দুর্ভাগ্য-পীড়িত প্রদেশকে-প্রদেশই করলো বর্জ্জন। দেশময় বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ, মহামারী। বিপুল সংখ্যায় জনগণ যখন এমনি যাযাবর হয়, তখন তাদের দুর্দ্দশার অন্ত থাকে না।

দেশের এমন দুঃসময়ে কুওমিন্তাং-সভ্যদের ভিতর এমন কেউ দরদী ছিলেন না, যিনি সময়োপযোগী প্রতিবিধান-মূলক কার্য্যপন্থা রচনা করতে পারেন। সেরূপ প্রবৃত্তিও অনেকেরই ছিল না। কমিউনিষ্ট পার্টির বিপ্লবী-দল হয়তো কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করতে পারতো, কিন্তু তাদের প্রতি তো সকল দলই বিরূপ, এমন কি সংস্কার-কামী নরমপন্থী কমিউনিষ্টরাও। তাই কমিউনিষ্ট পার্টি অবস্থা মস্কোর থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল সদস্যদের জানিয়ে কর্ত্তব্য সমাপন করলো। এ দুর্দ্দিনে একটি অঙ্গুলিও হেলন করলো না দেশবাসীর দুর্দ্দশা মোচনে। এমন নির্বিকার নিষ্ক্রিয় দেশকর্ম্মীর প্রতি দুর্গতদের কোন শ্রদ্ধা থাকবার কথা নয়।

মস্কো-নির্দ্দেশ

থার্ড ইণ্টারন্যাশনাল দিল নির্দ্দেশ, ছকে দিল চীনের কমিউনিষ্ট পার্টির কর্ত্তব্যের পথ। তবে সে উপদেশ গোপন, আর তার বাহক হলেন মিঃ রায়, বরোদিন। তখন কমিউনিষ্ট পার্টির জেনারেল সেক্রেটারী তু সিন্‌ তিনি হলেন চীন কুওমিন্তাং-এর বন্ধু। এমন লোকের হাতে মস্কো-কমিণ্টাং-এর পরামর্শ তুলে দিতে মস্কো-প্রতিনিধিদের ইতস্ততঃ করবারই কথা।

কিন্তু তাঁরা সে সংবাদ দিলেন ওয়াং চি ওয়াই'কে, কমিউনিষ্ট দলের প্রকৃত নেতা মনে করে। ওয়াং চি ওয়াই সাংহাই ধর্ম্মঘট দমনে সরকারী ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী-সাধিত হত্যাকাণ্ডে বিচলিত হয়ে হৈ-চৈ করেছিল, আগে বলা হয়েছে। কিন্তু ছাত্রসমাজ কান দেয় নাই, কারণ তারা বেশ জানতো এ লোকটার আন্তরিকতার অভাব। আর জনগণের ভিতর এসে কিছু করবার বা বলবার মত মনোবৃত্তি সে কোথা পাবে!

তবু চীনের জনসাধারণ ওয়াং চি ওয়াই'কে কিছুটা শ্রদ্ধা করতো। অনেকে তাকে কমিউনিষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল। তার কারণ আর কিছুই নয়, সে নিজে

ফ্যাশনের খাতিরে কমিউনিষ্ট বলে নিজেকে জাহির করে গর্ব্ব ও তৃপ্তি অনুভব করতো। কমিউনিষ্ট পার্টির অগ্নি-পরীক্ষার কোন কাজ সে করেছে, এমন কথা চীনের কেউ জানে না। এ লোকটির ওপরই ভার দেওয়া হলো মস্কোর আদেশ কার্য্যে পরিণত করবার।

মস্কো বলেছে—আর চীন কুওমিন্তাং-এর সঙ্গে সহযোগিতা করে চীনের কমিউনিষ্ট পার্টি চল্‌বে না, দক্ষিণপন্থীদের সঙ্গে তো নয়ই, বামপন্থীদের সঙ্গেও না। কৃষকদের ভিতর হতে মিলিশিয়া গঠন করে কৃষি-মজুবের স্বার্থ রক্ষা করা হোক!

সুতরাং মস্কোর উপদেশ অপাত্রে ন্যস্ত হয়ে অপহৃব হলো। কেউ তার খবর রাখ্‌লো না বিরোধীরা ছাড়া, এমন কি তু-সিন্‌ও না। তবে তিনি খবর বেখেও কত কি করতে পারতেন সে বিষয়েও ঘোব সন্দেহ আছে। কারণ সর্ব্বধর্ম্ম-সমন্বয়কারী দল সেকালে বল্‌তো যে তু-সিন্ সংস্কারবাদী। সংস্কারের সঙ্কীর্ণতাই এ জাতীয় লোককে দৃষ্টি প্রসারিত করতে দেয় না, কাজেই একটা ওলটপালট কর্‌তে যে দুঃসাহসের প্রয়োজন, যে একগুঁয়ে অধ্যবসায় অত্যাবশ্যক, তার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায় না এমন দুর্ব্বল প্রকৃতির, এমন সহজে ভেঙ্গে পড়া মেরুদণ্ড-বিশিষ্টদেব ভিতর।

মিঃ রায় আর বরোদিন হয় তো ওয়াংচি ওয়াইয়ের বাহিরের আদলে প্রতারিত হয়েছিলেন, ভিতরের মানুষটি তাঁদের চোখে ধরা দেয় নাই। তবে তাঁদের কার্য্য সহজ ছিল না। সে কার্য্যকে আরো ঘোরালো করেছিল চীনের সকল দলের গোয়েন্দা, কূটনৈতিক, হোটেল-বয়-বেশধারী গোপন পুলিশের দল আত্মগোপন করে সর্ব্বদা তাঁদের ঘিবে থেকে। চীনের এসকল দল-উপদল-অপদলের পরস্পর-বিরোধী স্রোতোধারা সর্ব্বকালেই বিদেশীকে করেছে অপদস্থ।

চীন বড় বিষম ঠাঁই। অতি সহজেই তথাকথিত বন্ধু মিলে, পরে দেখা যায় তাদের একটিও প্রকৃত বন্ধু নয়। পরোখ করে বেছে নিতে হয়, তখনো যারা সঙ্কোচহীন হয়ে মিশতে পারে, দেখাতে পারে অন্তরের গোপন চিত্র, তাকেই গ্রহণ করা যায় অন্তরঙ্গ বলে। সেরূপ কষ্টি পাথরে কষে না নিলে নির্ব্বুদ্ধিতার পরিচয় দিতে হয়।

আমি থাকতাম হোটেলে। সেখানে বন্ধু বলে হাত বাড়াতো সকলেই, গুপ্তসন্ধানীও। কিন্তু আমি প্রাণ খুলে কথা বলতাম কেবল তাদেরই সঙ্গে যারা আমায় আপন জ্ঞানে তাদের নিজ পরিবারের গোপন খুঁটি-নাটি কথা বলে বুক

হাল্‌কা কর্‌তো, অসঙ্কোচে আমার বিছানায় কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাক্‌তো, আমার সঙ্গে করতে সাহসী হতো ঘনিষ্ঠতার তুই-তোকার।

ওয়াং চি ওয়াই-য়ের সঙ্গে মিঃ রায়ের সেরূপ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল বলে মনে হয় না। যদি সেরূপ হতো তবেই মিঃ রায়ের পক্ষে সম্ভব ছিল বন্ধু ওয়াং চি ওয়াই-য়ের নাড়ী-নক্ষত্র জানা। বিশেষ করে ওয়াং চি ওয়াই ধনী পরিবারের সন্তান। যদিও চীনে জাতিভেদ নাই, তবু কাঞ্চন-কলুষ এমন ভেদ সৃষ্টি করেছে ধনী-নির্ধনে যে এ দু' শ্রেণী একে অন্যের নিকট সংশ্রবহীন বিদেশীবৎ।

চলন-বলন রীতি-নীতি ধনিকদের একেবারে স্বতন্ত্র। রিক্ত-নিঃস্বরা তার কাছে ঘেঁসতে পারে না, থাকে দূরে পর হয়ে। ধনিকের সম্বল সুবিধাবাদ। ওয়াং চি ওয়াই-য়ের সে মতিগতি সর্ব্বকালেই ছিল। সেজন্য ক'দিন পরে দেখা গিয়েছে ওয়াং চি ওয়াই নানকিন্ সরকারকে প্রতারিত করে চিরশত্রু জাপানীদের পোষ্যপুত্রে পরিণত হয়েছে।

মিঃ রায়ের দূরদর্শিতা এমন একটি অন্তঃসারহীন লোকের মুখোস ভেদ কর্‌তে পারে নাই, এটা দুঃখের বিষয়।

ফল এই হলো যে, প্রকৃত কমিউনিষ্ট কর্ম্মীরা রইলো মস্কো-সংবাদে অজ্ঞ। আর নানকিন্ সরকার, বিদেশী সাম্রাজ্যবাদী পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে কমিউনিষ্ট-বিনাশ সাধন করে চল্‌লো। রক্তাক্ত চীন অধীর হয়ে উঠ্‌লো। শুধু কমিউনিষ্টদের ওপরই নয়, কুওমিন্তাং-য়ের বামপন্থীরাও অত্যাচারে-নিপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে কেউ গিয়ে আশ্রয় নিল সাংহাইয়ের বিদেশী কনসেশনে, কেউ গেল বিদেশে। সারা এশিয়া আফ্রিকা এ পলাতকদের বিচরণভূমি হলো, ইংলণ্ড আমেরিকাও তাদের অগম্য রইলো না।

সেদিনে যে কমিউনিষ্ট দল কুওমিন্তাং-এর সঙ্গে কর্‌লো মিতালী, তারা আপন দলকে কর্‌লো প্রতারণা। তাদের কমিউনিষ্ট বলে বিশেষত্ব সমস্তই খসে পড়লো। এদের কর্ণধারেরা এরূপ অপকার্য্য করে নিজেদের সেয়ানা বলে আত্ম-শ্লাঘা লাভ করলেও এখানেই এর শেষ হল না।

অত্যাচার, নিপীড়ন, প্রতারণা, গোয়েন্দাগিরি চীনের দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়্‌লো। কোনও প্রকার বিপ্লবের পথেই প্রকৃত দেশকর্ম্মীরা আত্মপ্রকাশ কর্‌তে পারে না, পারে না কোন প্রকার প্রচার পরিচালিত করতে। মুখ ফুটে কথা বলাও তাদের বিপদ। নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সেনা-গঠনকারী চু তে

আর কৃষক-বন্ধু মাও সে তুন্ যাত্রা করলেন পার্ব্বত্য-প্রদেশ অভিমুখে। পথিমধ্যে তাদের হলো সাক্ষাৎ। ফলে জন্ম পেয়েছিল চালিন সোভিয়েট। সে কথা পূর্ব্বে বলা হয়েছে।

মস্কো যে উপদেশ দিয়েছিল তা ওয়াং চি ওয়াই আত্মসাৎ করে উদাসীন হয়ে রইলো। কিন্তু অজানিতেই তা অক্ষরে অক্ষরে পালিত হলো চালিন সোভিয়েট প্রতিষ্ঠার দ্বারা, শ্রমিকের মিলিশিয়া গঠন দ্বারা। প্রকৃত যারা জনগণ তারাই বন্দুক ঘাড়ে করে এগিয়ে এল জন-স্বার্থ রক্ষায়।

দমন-নীতির নিষ্ঠুরতা থেকে উদ্ভব হলো শক্তি-সঞ্চয়ের সংগঠন।

চালিন সোভিয়েটের পরিণাম

চালিন সোভিয়েটের একপাশে পাহাড়ের গায়ে গায়ে ছিল অতি পুরাতন একটা প্রাচীর। যাকে সেকালে বলা হতো চীনের দ্বিতীয় প্রাচীর। এখন তার জরাজীর্ণ অচল অবস্থা। মাও সে তুন সে জীর্ণ সংস্কার করেন নাই। তিনি গড়ে তুলেছিলেন সচল বিদ্রোহ-প্রাচীর, যার সাহায্য পাওয়া যাবে জড়-প্রাচীর অপেক্ষা শতগুণে বেশি।

কিন্তু চিয়াং-সরকার তাঁদের স্বস্তি দিল না। কোয়ান্টাং, কিয়াংসি, ফুকিন, হোনান্ প্রদেশ হতে যাতে কোনরকম খাদ্য-সামগ্রী সোভিয়েট চীনে প্রবেশ করতে না পায় তাব ধরাকাট সুরু হলো। ফলে চালিনে লবণ-সঙ্কট দেখা দিল। অনেকে স্বেচ্ছায় লবণ খাওয়া বন্ধ করলো। কিন্তু তা সকলের পক্ষে সম্ভব নয়, স্বাস্থ্য-প্রদও নয়।

বিশেষ করে যারা লঙ্কাপ্রিয় (যেমন হোনান প্রদেশবাসী) তাদের লবণ ছাড়া এক দিনও চলে না। মাও সে তুন্ নিজ প্রদেশীয়ের রীতি সমর্থনে বলতেন,—উগ্র-প্রাণ লঙ্কা না খেলে বিপ্লবী হতে পারা যায় না। চু তে এ সব উগ্রখাদ্যের সমর্থক নন। তিনি জবাব দিতেন,—উগ্রখাদ্যে আনে বিদ্রোহের চাঞ্চল্য, স্থির বুদ্ধি নয়। যা সাময়িক উত্তেজনা আনে, তার প্রতিক্রিয়া নিম্নগামী, স্তব্ধতা। সাময়িক প্রভাবের তারিফ করা যায় না।

যা হোক লবণ রেশন করা হলো। সোভিয়েটে উৎপন্ন জিনিষ দিয়েই কোন রকমে কর্ম্মী দলের দিন গুজরান্ হয়। অর্দ্ধাহারে দ্বিগুণ কাজ করে যারা

কোন রকম অতৃপ্তি বোধ করে না, তাদের সামান্য অভাব বিচলিত করতে পারে না। কিন্তু সে রিক্ততার তৃপ্তিটুকুও চিয়াং-সরকারের অসহ্য হলো।

জীবন-মরণ যুদ্ধ

চিয়াং কাই শেক প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। একদিন হাজার হাজার সরকারী সেনা বিদেশী এরোপ্লেন, কামান, মেশিনগান নিয়ে এসে চড়াও হলো চালিন সোভিয়েটের ওপর। চালিন সোভিয়েট যথাসাধ্য বাধা দান করলো, কিন্তু শেষ রক্ষা করতে পেরে উঠলো না।

একদিকে কৃষক-মজুর প্রাণের দায়ে হাতিয়ার ধরেছে, অপর দিকে বেতন ভোগী বিবেকবর্জ্জিত নরপশুর হস্তে উচ্চাঙ্গের মারণাস্ত্র। তথাপি তরুণ তরুণী বৃদ্ধ-প্রৌঢ় সোভিয়েট কর্ম্মীর মামুলি অস্ত্রের আঘাতে হুকুম-তামিলকারী কাপুরুষ সিপাহীরা বেশিক্ষণ আর মুখোমুখি লড়াই চালাতে পারলো না, হলো পলায়ন-পর। কিন্তু পশ্চাৎ হতে সেনানায়কগণ মেশিন-গান উদ্যত করলেন পলাতক সৈনিকের ওপর। কাপুরুষেরা পলায়নের পথ রুদ্ধ দেখে উপায়ান্তর না পেয়ে আবার লড়াইয়ে যোগ দিল।

অমিত তেজে যুদ্ধ চল্‌লো কয়েক দিন ধরে। বিপক্ষে অগণিত সেনা, একটি মরে তিনটি এসে তার স্থান অধিকার করে। কিন্তু সোভিয়েটের হতাহতের সংখ্যা আর পূরণ হয় না। এমন ভাবে কতকাল আর যুদ্ধ চালানো সম্ভব। কয় দিনেই চালিন সোভিয়েট পক্ষের প্রায় যাট হাজারের মত লোকক্ষয় হয়েছে। বিশেষ করে এরোপ্লেন হতে গ্রামে গ্রামে বোমা-বর্ষণের ফলে।

চু তে আর মাও দেখলেন এমনিভাবে লোকক্ষয় করে আর লাভ নাই। সরকারী সেনা অগণিত, চালিন সোভিয়েটের অবশিষ্ট নরনারী প্রাণ দিয়েও কোন সুফল পাবে না। তার চেয়ে তাঁরা যদি এমন অঞ্চলে যান যেখানে এরোপ্লেন থেকেও তাঁদের ঘাল করা সম্ভব হবে না, তা হলে আবার সোভিয়েট স্থাপন করে সমানে সমান লড়্‌তে পারা যাবে।

এমন স্থান আর কোথাও নয়—আছে উত্তরে। সোভিয়েটের পরামর্শ-সভায় তা-ই-স্থির হলো। পরিকল্পনা করে পথরেখা ছকে নেওয়া হলো। তার পরে গোপনে পার্ব্বত্য পথে সরকারী সেনার চক্ষুর অন্তরালে চল্‌লো সে

কূটনৈতিক স্থানান্তর করণ। পর্বতময় রাস্তা, গোপন পথ, চারদিকের গ্রামবাসীর তলে তলে সহায়তা, চু তে আর মাও সে তুন দলবল নিয়ে চালিন ত্যাগ করে চলে গেলেন।

'জিউ' ও লি খং খং'

১৯৩৩ খৃঃ অঃ ১৬ই অক্টোবর নব্বই হাজার ভর্তি সোভিয়েট কর্ম্মী নরনারী স্থলপথে এগিয়ে গেল উত্তর দেশ অভিমুখে। রাস্তায় অনেক সরকারী ঘাঁটি অতর্কিতে আক্রমণ করে তাঁরা উত্তরে যাবার পথ নিষ্কণ্টক করলেন। চিয়াং কাই শেকের এত সাধের অভিযান বৃথা হলো।

সোভিয়েট কর্ম্মীরা যাত্রা করবার পর দেখা গেল হাজার হাজার কৃষক স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নিয়ে উত্তরে যাবার জন্য রওনা হয়েছে। এ সব কৃষক-মজুর কমিউনিজম বোঝে না, কিন্তু চায় শান্তিতে থাকতে। তারা গত পাঁচ-সাত বৎসর পেয়েছে সোভিয়েট কর্ম্মীদের উপদেশ, পেয়েছে নানা প্রকার সহায়তা, তারা দেখেছে সোভিয়েটে সবাই সমান—জুলুম নাই শোষণ নাই। সোভিয়েটে অভাব নাই। কাজেই চিয়াং সরকারের এলাকার চেয়ে সোভিয়েট তাদের কাছে লোভনীয়।

চালিন সোভিয়েট থেকে এই যে পথযাত্রা—সে যে কি বিরাট ব্যাপার তা লিখে বুঝানো যায় না। আমি যখন সেনা-বিভাগের চাকরিতে ছিলাম, তখন প্রথম মহাযুদ্ধে অংশ গ্রহণ করতে হয়েছিল। মোটর-ট্রাক চলবার মতো পথ ছিল না, এরোপ্লেন সাহায্যে দ্রুত সৈন্য চলাচল রেওয়াজ হয় নাই, রেল লাইনও ছিল না সে স্থানে। আমাদের করতে হয়েছিল মার্চ্চ, দিনের পর দিন। দৈনিক ত্রিশ মাইলের কম কোন দিন মার্চ্চ করি নাই। ওরই মাঝে মাঝে দুষমনেরা হানা দিত। সে খণ্ড-যুদ্ধের পরে আবার মার্চ্চ। তখন বুঝে ছিলাম দলে-বলে জুটে এক স্থান হতে দূরবর্ত্তী কোন স্থানে যাওয়া ব্যাপারখানা কী কষ্টকর। অনেকে ওষ্ঠাগত প্রাণ হয়ে বলতো—আর সহ্য হয় না, এর চেয়ে মৃত্যু ভাল। তবু আমরা চলেছিলাম দু সপ্তাহ মাত্র, মাসের পর মাস আমাদের চলতে হয় নাই।

কিন্তু সোভিয়েট-কর্ম্মীরা চলেছিল মাসের পর মাস। পর্ব্বত নদী পার হতে হয়েছে কত, কত স্থানে সরকারী সেনাদলের সঙ্গে হয়েছে হাতাহাতি লড়াই। কত স্থানে গ্রামে পায় নাই খাদ্য-সাহায্য, কতদিন ক্রমাগত বৃষ্টিতে ভিজে রোদে

পুড়ে রোগে ভুগে ভুগেও তাদের চল্‌তে হয়েছে পথ। খাদ্য নাই, পথ্য নাই, নাই রোগে ঔষধ তারা চলেছিল অজানা পথে। তবু তারা ভেঙ্গে পড়ে নাই, দুর্ব্বলতা আসে নাই মনে।

এখানে নেতাদের দুর্জ্জয় সাহস আর অদম্য উৎসাহের তারিফ করতে হয়। কী সে মৃত-সঞ্জীবনী বাণী, যা তাঁদের করেছিল সর্ব্বংসহ? স্বাধীনতার যে স্বাদ তারা পেয়েছিল তারই অমৃত স্পর্শ তাদের করেছিল মৃত্যুঞ্জয়ী। এত দুঃখ-কষ্ট ভোগ এত বিপদ বরণ—অবশেষে সকলই হলো সার্থক। তারা এসে পৌঁছালো উত্তর চীনের শেন্‌সি প্রদেশে। পর্ব্বতসঙ্কুল ইনান শহর হলো তাদের পরিত্যক্ত চাঁলিন এর দোসর।

জিউ ও লি খং খং—পঞ্চবিংশ পরিক্রমা। এর আগে আরো চব্বিশ বার হয়তো তাঁদের করতে হয়েছিল শফর, করতে হয়েছিল স্থানত্যাগ, তাই এ পরিক্রমা পঁচিশ নম্বরের। কিন্তু সেটা বড় কথা নয়, সব চেয়ে বড় সত্য, সব কিছু বিপন্ন করবার পুরস্কার, সব চেয়ে আশার আলো এই যে সুদীর্ঘ ছ' মাসের পথে যে গ্রামই তাঁরা পেয়েছেন, সেখানেই মিলেছে সমবেদনা, মিলেছে সহানুভূতি, মিলেছে মায়ের দরদ। চিয়াং কাই শেকের পাষাণ-বিদারী বিরোধ-প্রয়াসও চীনের বুক থেকে সে অমৃত ছিনিয়ে নিতে পারে নাই, বরং চিয়াং-এর নৃশংসতার অনুপাতেই তা চক্রবৃদ্ধি সুদসহ বৃদ্ধি পেয়েছে গণ-মনে উত্তরোত্তর। অনন্ত-মরণের অভিশাপ এটা, যা থেকে নিস্তার নাই কারো।

চিয়াং-এর প্রতি উত্তর চীনের জনগণের বিদ্বেষের প্রধান কারণ তার 'রিকভারিং আর্মি' গঠন, যারা কৃষকদের গরু-ঘোড়া চুরি করে আত্ম-পোষণ করতো। সে অঞ্চলের লোক ওদের বল্‌তো কুওমিন্তাং-লুঠেল, আর কমিউনিষ্ট পরিচালনায় করতো প্রতিরোধ।

কৃষক ইউনিয়ন, ট্রেড ইউনিয়ন, নারী সমিতি, যুব-সমিতি, সমবায় সমিতি সকল জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গেই—কমিউনিষ্টরা এখানে মিলিত হয়েছিল।

জাপানের রক্তপিয়াস

সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ

প্রেসিডেণ্ট হবার পর থেকেই চিয়াং কাই শেক জাপানের পোষা পাখী, তার শেখানো বুলিই কপচায়, তার পরিবেশিত খাদ্যই খায়। কিন্তু সেই চতুর জাপানী মাঞ্চুরিয়া গ্রাস করে, চাহার প্রদেশ উচ্ছেদ করে যে দিন অন্তঃমঙ্গোলিয়ায় প্রবেশ করলো, চিয়াং একটুও ভাবিত হন নাই।

তিনি ধরে নিলেন বন্ধু জাপান কমিউনিষ্ট-দস্যু চু তে আর মাও সে তুন্-এর চোরা আড্ডা ভেঙ্গে দেবে। যাদের দেশে তাঁর প্রতাপ প্রতিহত, সে দেশ বন্ধু জাপান নিলেও তাঁর কোনো ক্ষতি নাই। কাজেই চিয়াং রইলেন নিশ্চল, মনে মনে একটু খুশিও হলেন যে তৃতীয় পক্ষ দ্বারা শত্রু দমন করা গেল, তাঁর কোন ব্যয় বহন করতে হলো না।

কিন্তু দিগ্বিজয়ী জাপান রক্তের আস্বাদ পেয়েছে, তাকে তার লোলুপতা থেকে কে করতে পারে বারিত। সে চীনের উত্তরে-দক্ষিণে এককালে সুরু করলো অভিযান, কয়েক সপ্তাহ মধ্যেই পিকিন টিয়েনসিন দখল করে নিয়ে হুপেই প্রদেশে প্রবেশ করলো। আর্ত্ত চীৎকারে চিয়াং সকল শ্বেত সাম্রাজ্যবাদীর দ্বারস্থ হলেন, কিন্তু শ্বেতাঙ্গদের মুখে স্তোকবাক্য ছাড়া কিছু পেলেন না।

পাবেন কি করে? সাম্রাজ্যবাদীদের গোপন ইঙ্গিতেই জাপান হয়েছে অকুতোভয়। কিন্তু এখন যে সে সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে, সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত-মার্জ্জারদের গোঁফ চুল্‌বুল্ করে উঠ্‌লো শিকারের গন্ধে। অমনি দাপ্পাবাজ জাপান দিলো ধমক—Hands off China (চীনে হাত বাড়িও না)। গোঁফ-চুম্‌রে বাক্‌হত হয়ে গেল শ্বেতকায় দল।

জাপানীরা উত্তরে হুপেই প্রদেশ পর্য্যন্ত এসে থেমে গেল। নিজের ইচ্ছায় নয়। কমিউনিষ্টদের প্রতিরোধে পশ্চিমে এগুনো সম্ভব হলো না। শেন্‌সি প্রদেশের পশ্চিম অর্দ্ধের ও পূর্ব্বাংশের কিছু কিছু কমিউনিষ্টরা গোড়া থেকেই জুড়ে বসেছিল, সেখানে জাপান দন্তস্ফুট করতে পারলো না। সারা দুনিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেল।

দেশবাসীর আশার সঞ্চার হলো, আর তারা চিয়াং-এর মতিগতিতে হলো উত্ত্যক্ত। চিয়াং জাপানীদের বাধা দেওয়া দূরে থাক জেনারেল চেন্‌কে সাহায্য

পর্য্যন্ত করলো না। 'সাংহাই ইন্‌সিডেণ্ট' অবাধে সম্পন্ন হলো। তবু চিয়াং-য়ের মোহ কাটে না, এমন কি নানকিন্ হতে জাপানী উপদেষ্টাকে পর্য্যন্ত বিদায় করে দেওয়া হয় নাই।

ছাত্রসমাজ একদিন জাপানী উপদেষ্টাকে ঢিল ছুড়ে মারমুখো হয়ে পেছন নিল। অতি কষ্টে ব্রিটিশ আশ্রয়ে ছুটে গিয়ে সে শির বাঁচালো। কিন্তু এল পুলিশ, পাকড়াও হলো অপরিণামদর্শী অপ্রাপ্ত-বয়স্ক ছাত্রের দল। তারা গেল জেলে, অভিভাবকরা পর্য্যন্ত নির্য্যাতিত হলো।

প্রাপ্তবয়স্ক ছাত্র-সমাজ তবে কোথায়? তারা তখন উত্তরে, মাঞ্চুরিয়ায় গেরিলা-দল পুষ্ট করছে।

এদিকে রণমত্ত জাপানী সাংহাই দখল করে (১৯৩৭) নানকিনের দিকে অগ্রসর হলো।

চিয়াং-এর সমরাভিনয়

বাধ্য হয়ে চিয়াংকে জাপানী-সেনার সঙ্গে লড়ে যেতে হলো, রাজধানী সরিয়ে নিতে হলো চুংকিনে। তাঁর আবেদন-নিবেদনে শ্বেত সাম্রাজ্যবাদী কেউ অজুহাত খাড়া করলো দেশে ধর্ম্মঘটের, কেউ জানালো অতিরিক্ত উৎপাদনের অভাব, কেউ বা কান দেবার ফুরসৎ পেলে না নিজ দেশের অশান্তি-বিশৃঙ্খলার বিক্ষিপ্ততায়। ফলে কেউ করলো না সাহায্য একটি ছুঁচ দিয়েও। বেশির ভাগ, আমেরিকা-প্রবাসী চীনারা যে ঔষধ-পথ্য, মেডিক্যাল বই প্রভৃতি পাঠালো চীনের জন্য, তা ক্রমাগত গিয়ে স্থান পেল জাপানের ভাণ্ডারে নেহাৎই 'ভুল ভ্রান্তিতে'।

চিয়াং কাই শেক হাড়ে হাড়ে বুঝলেন, দুধ কলা দিয়ে শুধু জাপানী সাপকেই পোষেন নাই, সকল সাম্রাজ্যবাদীরই এক রা'। মনের দুঃখ মনে মেরে তিনি নামে-মাত্র প্রতিরোধ করছেন জাপানীকে, তবু এক চোখ তাঁর সব সময়েই থাকে মাও আর চু তে'র ওপর। তখনও চিয়াং সরকারের পুরস্কার ঘোষণা বলবৎ রয়েছে ও-দুটা দস্যুর মস্তকের বিনিময়ে।

একদিকে জাপানী দুষমন অন্যদিকে চিয়াং-এর ফৌজ—এ দুয়ের মাঝে পড়েও মাও শঙ্কিত হন নাই। তিনি অবিরাম জাপানী সেনাকে নিতান্ত অসময়ে অতর্কিত আক্রমণে কাবু করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে তাদেরে করছেন ঘাল।

পল্লীতে পল্লীতে কৃষক সেনা তৈরি হলো। তাদের চাষের জমি ভাগ করে দিয়ে বুঝানো হলো—জমির মালিক তারাই। কাজেই তাদের নিজেদের জমি নিজেরা রক্ষা না করলে আর কে এগিয়ে আস্‌বে রক্ষা করতে!

জাপানীরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হওয়া মহা ক্ষতিকর ব্যাপার দেখে বৃথা সেদিকে সময় নষ্ট না করে দক্ষিণ দিকেই দিল অপরিসীম চাপ। ফলে ক্রমে সানটাং, হুনান আর কিয়াংসি প্রদেশের পতন হলো। চীনের যুদ্ধ নেতারা পর পর দক্ষিণ দিকেই পালাতে থাক্‌লো।

সকল দেশেই চাষীরা জমি আঁকড়ে থাকে, কিছুতে ছেড়ে যেতে চায় না। মাঞ্চুরিয়া বেদখলের পরও কৃষকরা বাস্তুত্যাগী হয় নাই। তারাই ছাত্রসমাজের নিপুণ পরিচালনায় গেরিল্লা যুদ্ধ পাকিয়ে তুল্‌লো, জাপানীরা হিম্‌সিম্ খেয়ে গেল। কাজেই জাপানীদের শুধু রেল লাইনের বড় বড় স্থানগুলি অধিকার করেই তৃপ্ত থাকতে হলো। সামরিক শক্তির জোরে প্রতিটি স্থান রক্ষণাবেক্ষণ করতে হলে সারা দেশ কিছুতেই দখল করা যায় না। সেজন্য যে সেনাবলের দরকার তত সংখ্যায় সেনা পৃথিবীর কোনো একটি জাতির নাই, জাপানেরও ছিল না।

কৃষকদের গেরিলা যুদ্ধ দেখে ভয়েই মাঞ্চুরিয়া হতে ধনিক চীনারা কর্‌লে পলায়ন। জমির মালিক এখন গেরিলা-দল, তাদের সঙ্গে যুঝে জমিদার শ্রেণীর সুবিধা হবে না এ সময়ে, তাই তারা সুদিনের আশায় যে যেখানে পার্‌লো গা-ঢাকা দিল। ভেবেছিল জাপানীরা শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপন কর্‌লে আবার ফিরে আস্‌বে। কিন্তু দিনের পর দিন চেষ্টা করে জাপানীরা বড় বড় শহর মাত্র জুড়ে রইলো, চীনাদের মন জয় করতে অসমর্থ হলো।

জাপানীরা এবার তাই থমকে দাঁড়ালো। তারা দেখলো আর বেশিদূর চীনের ভিতর প্রবেশ কর্‌লে তাদের সাগরতীরের সঙ্গে যোগাযোগ অটুট থাক্‌বে না, গেরিলা তৎপরতায় তারা হবে বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত।

জেনারেল চিয়াং কাই শেক জাতি-সঙ্ঘের নিকট আকুতি জানিয়েও কার্য্যতঃ কোন প্রতিকার পেলেন না। ওদিকে কমিউনিষ্ট ডান্‌পিটেরা বল বৃদ্ধি করে নিয়েছে, শুধু তা নয় জনমতও তাদের ইচ্ছামত গঠন করে ফেলেছে। চিয়াং পড়েছেন ফাঁপরে। আবার জাপানীরা তাদের অধিকৃত অঞ্চল হতে কাঁচামাল খনিজ পদার্থ যতটা সম্ভব লুণ্ঠন সুরু কর্‌লো। কিন্তু সমর-পরিচালনা যেন টিমিয়ে এসেছে।

এ সময়ে বোম্বেতে আমার দেখা হয় জাপানী এক নাবিকের সঙ্গে। সে আমার পরিচয়-পত্র পড়ে স্পষ্ট ভাষায় বল্‌লে,—জাপানের এখনই উচিত চীন যুদ্ধ বন্ধ করে চিয়াং-এর সঙ্গে সন্ধি করা। নইলে কমিউনিষ্টরা আরো শক্তি সঞ্চয় কর্‌লে সন্ধি সম্ভব হবে না। অথচ জাপানের সামরিক শক্তি আর বৃদ্ধির উপায় নাই। ক্রমেই তাতে ভাটা ধর্‌বে যতই দিন এগুবে।

কথাটা সেদিন পরিষ্কার বুঝ্‌তে পারি নাই। কিন্তু এক বৎসর পরে বুঝেছিলাম, জাপানী নাবিক নিছক সত্য বলেছে, আর প্রকাশ করেছে, জাপানের গণমনের জাগ্রত অভিব্যক্তি। কিন্তু গর্ব্বময় সামুরাই পার্টি কেবল ধাপ্পার ওপরই চল্‌লো। যেমন চল্‌লো চিয়াং গণমন হতে নির্ব্বাসিত হয়ে।

কমিউনিষ্টদের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার মূলে রয়েছে রুশ সোভিয়েটের সাহায্য, এমন একটা গুজব জাপানীরাই প্রচার করেছিল। কিন্তু সে কথা ভিত্তিহীন। কমিউনিষ্টরা যা অস্ত্রশস্ত্র পেয়েছে, তা চিয়াং-এর জোরজুলুমে খাড়া করা পাঁচ-মিশালি মিলিশিয়া থেকে সস্তা দামে কিনে। প্রচারের ফলে সেরূপ মিলিশিয়া হয়ে পড়েছে সোভিয়েট-কর্ম্মী। রুশের দেওয়া সমরোপকরণ যদি তারা পেত, তবে প্রাণ বিপন্ন করে জাপানী সৈনিকের হাতিয়ার কেড়ে নিতে যেত না।

চিয়াং-এর সৈনিকের বেতন সওয়া চার ডলার। খোরাক-পোষাক অবশ্য মিলে। কিন্তু সে খাদ্য যথেষ্ট নয়। তুলনায় সোভিয়েট-কর্ম্মীর আহার উৎকৃষ্টতর। কাজেই চিয়াংএর সেনাদলে অসন্তোষ জ্বল্‌ছে। তারা সুযোগ পেলে সোভিয়েটে গিয়ে সব-সমান হবার লোভ সামলাতে পার্‌বে কেন?

কমিউনিষ্টরা যখনই যেটুকু এলাকা দখল করেছে (জাপানীর কাছ থেকেই হোক আর চিয়াং কাই শেকের কাছ থেকেই হোক) সেখানেই পুনর্গঠন কর্‌তে আগে মন দিয়েছে। জমি বাঁটোয়ারা, কুটীর শিল্প প্রবর্ত্তন, ফ্যাক্‌টরী চালু করা। কাজেই নতুন অধিকার করা এলাকাও অল্পদিনে স্বয়ং-পূর্ণ হয়ে উঠেছে। অভাব দূর হয়েছে।

এজন্য প্রতি অঞ্চলেই তাদের ধর্ম্মগোলা স্থাপিত, যেখানে ধান চাল কাপড় পোষাক বরাদ্দমত প্রতি মাসের প্রথম ভাগেই বিলি হয়।

জাপানের মৃত্যু-বাণ

একদিন জাপান আপন মৃত্যু-বাণকে করলো আবাহন। পার্ল হারবারে বোমা বর্ষণ হলো। আমেরিকা বুঝলো মন্‌রো ডক্‌ট্রিন্ অকেজো, জাপানী

তোষণ হয়েছে অসঙ্গত। সহসা চিয়াং-য়ের সঙ্গে বুঝা-পড়া হয়ে গেল। সমর-সম্ভার এল। চিয়াং নামলো সত্যকার যুদ্ধে।

চিয়াং সুয়ে লিয়ান্ পারে নাই চিয়াংকে বন্দী করেও তাঁর আগ্রহ জন্মাতে জাপানী উচ্ছেদে। চৌ এন লাইয়ের যুক্তিতর্ক হয়েছে নিরর্থক চিয়াং-য়ের কাছে! কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গো-আমেরিকা আজ নিজ গরজে চিয়াং-কে দাঁড় করালো কুশ-পুত্তলরূপে (A colossus stuffed with clouts)। জাপানের বদলে আমেরিকা হলো অভিভাবক, চিয়াং-এর লাভ-লোকসান সমানে সমান।

তা বলে সমর-ব্যস্ততায় চিয়াং যে কমিউনিষ্টদের ভুলে গেছেন এমন নয়। প্রথম সুযোগেই কমিউনিষ্ট-অধ্যুষিত এলাকার পাশে পাশে তিনি স্থাপন করলেন তাঁর বাছা বাছা ফৌজ। তিনি স্থির জেনেছেন, বিদেশী জাপানী আজ আছে, কালই তার বিষদাঁত ভাঙ্গবে ইঙ্গো-আমেরিকার হাতে। তখন ঘরের শত্রু কমিউনিষ্টদের সঙ্গেই করতে হবে হিসাব-নিকাশ। সেজন্য চাই টাকা।

দুর্নীতি প্রচার

তিনি তখন দুর্নীতির চরম আশ্রয় গ্রহণ করলেন চীনের দিকে দিকে শুধু অর্থ-সংগ্রহে। যত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ, সবই নিলামে তোলা হলো। যেমন করে আমাদের দেশে খেয়াঘাট (অর্থাৎ নদীসমূহে খেয়া পারাপারের ব্যবস্থা) গুলা হয় নিলামে বিলি। পদপ্রার্থীদের ভিতর যে সর্ব্বোচ্চ পবিমাণ অর্থ দিবার প্রস্তাব করলো, তাকেই সে পদ দেওয়া হলো, যোগ্যতার কোনই মর্য্যাদা দেওয়া হলো না।

ফলে নব-পদপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আবার তার অধীনের সকল মহকুমা-হাকিমের পদকে অনুরূপ নিলামে তুলে নিজের ক্ষতি তো পূরণ করলোই, অধিকন্তু প্রচুর মুনাফাও উঠালো। মহকুমা হাকিমেরা আবার নিজ নিজ এলাকার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী নিয়োগ পূর্ব্ব-কথিত নিলামের সাহায্যে পূর্ণ ক'রে, আবগারি দোকান, কেরাসিন ও পেট্রল এজেন্সি প্রভৃতির নিলাম থেকে যথেষ্ট লাভবান হলো।

সাধারণের কি দুর্দ্দশা হলো তা আর বেশি বলতে হবে না আশা করি। দেশময় মূল্যবৃদ্ধির হিড়িক। এমন দামে সকল রকম পণ্য বিক্রয় হতে লাগলো যা অভাবনীয়। কণ্ট্রোলের নাম দিয়ে ব্রিটিশ ঢুকিয়েছিল চোরাবাজার সমগ্র ভারতে, কৃত্রিম উপায়ে ফাঁপিয়ে তুলেছিল পণ্যের মূল্য, চীনের অবস্থাও তা-ই হলো। হাহাকার পড়ে গেল চীনের ঘরে ঘরে।

সেদিনে কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে, ছাত্রসমাজের তরফ থেকে প্রচার চল্‌লো—জাপানীর পরাজয় না হলে চিয়াং কাই শেকের অপসারণ না হলে দেশে প্রকৃত স্বাধীনতা আসবে না। এভাবে কমিউনিষ্টরা সর্ব্বদা প্রচার দ্বারা জনমতকে করেছে প্রভাবিত, আর চিয়াং কাই শেক করেছেন জনমতকে পদদলিত। তার যা অবধারিত পরিণাম তাই দেখা দিয়েছে চীনবাসীর মনে।

সাম্রাজ্যবাদী ষ্টিলওয়েল পর্য্যন্ত চিয়াং কাই শেককে যে সুবুদ্ধি দিচ্ছেন সোজা পথে চল্‌তে, তা অগ্রাহ্য করে চিয়াং চলেছেন তাঁর স্বার্থ উদ্ধারের বাঁকা পথে।

ওদিকে জাপানীরা খাড়া কর্‌লো এক তাঁবেদার রাষ্ট্রনায়ক তাদের অধিকৃত এলাকায়। ব্যক্তিটি আর কেউ নয়, স্বয়ং হামবড়া ওয়াং চি ওয়াই। তাকে সমুখে রেখে তখনও জাপানীরা চীনে প্রবাহিত কর্‌ছে রক্ত-বন্যা।

কমিউনিষ্টরা ইয়াংসি নদের উত্তর তীর পর্য্যন্ত ভূ-ভাগে নীরবে তৈরি করছে ঘাঁটির পর ঘাঁটি, তৈরি কর্‌ছে বিপ্লবী-সৈনিকদল। জাপান কমিউনিষ্টদের কিছুতেই ঠেলে সরাতে পার্‌ছে না এক ফুট।

ইউরোপে ষ্টালিনগ্রাদের পতন হলো না। উল্টে রুশরাই সুযোগ বুঝে জাপানীর টুটি চেপে ধরলো চীনের উত্তরে।

চীনেও জাপানীরা শত এরোপ্লেনে, মেশিনগানে পারলে না ঘাল করতে মাও সে তুনের নতুন ইনেন সোভিয়েট।

ইঙ্গো-আমেরিকা বিস্ময়ে চকিত হয়ে উঠ্‌লো। হিরোশিমায় মরণ-বাণ নিক্ষিপ্ত হলো, জাপান খান খান হয়ে গেল।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত। জাপানীদের আত্ম-সমর্পণ। যারা বুক নিঙড়ে রক্ত দিল চীনের জন্য তাদের কাছে নয়। জাপানী গেল, কিন্তু চীনের রক্তক্ষরণ বন্ধ হলো না। মহাচীন, অবনমিত, শোষিত মহাচীন তখনও দিকে দিকে রণদামামা বাজাচ্ছে—রক্ত দাও, অস্থি দাও, অবহেলিত-স্বাধীনতার ঋণ এখনও শোধ হয় নাই।

অন্তহীন নহে অন্ধকার

জনগণের মুক্তি-সংগ্রাম

সিমোনোসেকি আর হিরোশিমায় হলো আণবিক বোমার প্রলয় কাণ্ড! সোভিয়েট রুশ যুদ্ধ ঘোষণা করলো জাপানের বিরুদ্ধে। তবু জাপানকে উত্তর-চীনে দুর্ব্বল মনে হলো না। মাঞ্চুরিয়া রণাঙ্গনে সাত দিন ব্যাপী করাল যুদ্ধের পর সিৎসিহার আর হারবিন্ দখল করলো রুশ-সেনা। তৃতীয় সপ্তাহে সোভিয়েট রুশ চাংচুন্ আর মুকদেন অধিকার করে বস্‌লো।

এর পরই দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ সমাপ্ত। জাপানীদের যে বিরাট সেনা চীনে ছিল, তাদের আত্মসমর্পণে দীর্ঘকাল কেটে গেল। আত্মসমর্পণের পর দেখা গেল সোভিয়েট রুশ সমগ্র মাঞ্চুরিয়া, জহোল, চাহার আর পোর্ট আর্থার সহ দেরিয়েন দখল করে নিয়েছে।

তখনো কিন্তু জাপানী সৈন্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে উত্তর হাইনেন-কিয়াং আর কিরিন্ প্রদেশের গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করে ছিল। বাগে পেলেই তারা কর্‌তো অতর্কিত আক্রমণ। সোভিয়েট রুশও নিশ্চেষ্ট রইলো না। ক্রমে ক্রমে এই আইনভঙ্গকারী সেনাদলকে নির্ম্মূল করলো খণ্ডযুদ্ধে আর বন্দী করে সাইবেরিয়ায় অন্তরীণ রেখে।

উত্তর-চীনে তো এই অবস্থা—জাপানীরা আত্মসমর্পণ করলো রুশের কাছে। আর দক্ষিণ চীনে তখন খাসা লুকোচুরি খেলা। জাপানীরা কমিউনিষ্টদের কাছে করে না আত্মসমর্পণ, কমিউনিষ্ট দল দেখলেই লড়াই চালায়, তার পর কুওমিন্তাং ফৌজ দেখতে পেলেই করে বেকসুর আত্মসমর্পণ। এমন কি কুওমিন্তাং অফিসারদের সে কাজে জাপানী সেনানায়কেরা নিজেরাই সাহায্য করেছে নিজেদের খানাতল্লাস ও বন্দীকরণ ব্যাপারে।

দেখে-শুনে কমিউনিষ্টরা আড়ালে থেকে দাঁত কিড়্‌মিড়্ করে। কিন্তু উপায় কি ?

ওদিকে আবার দলে দলে কুওমিন্তাং পল্টন রণক্ষেত্র হতে ফিরে এসে প্রবেশ করে শহরে গ্রামে অপসারিত জাপানীদের স্থান গ্রহণ কর্‌তে। দেশবাসী তাদেরকেই বিজয়ী বীর বলে সম্বর্দ্ধনা করে, দেয় জয়মাল্য। কারণ কমিউনিষ্ট সেনা

থাকে গুপ্ত, তাদের চলাচল আড়ালে। দেশবাসী এ গোপনতার জন্য তাদের ওপর তুষ্ট নয়। তাই জনগণ সব জেনে-শুনেও চিয়াং-সরকারের সেনাদলকেই অভ্যর্থনা জানায়—জাপানী অত্যাচারের সমাধিতে তারা এতটা উৎফুল্ল।

সে ব্যবস্থায়ও কমিউনিষ্টদের উপস্থিত হয় গাত্রদাহ। কিন্তু নিরুপায়। এ যেন কমিউনিষ্টদের বিরুদ্ধে একটা সেয়ানা ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল। শত্রু-মিত্র সেখানে একাকার।

জাপানী সেনার আত্মসমর্পণের পালা শেষ হলে চিয়াং কাই শেক তথা ইঙ্গো-আমেরিকার নজর পড়লো মাঞ্চুরিয়ার দিকে। সোভিয়েট রুশকে অনুরোধ করা হলো, সে অঞ্চল কুওমিন্তাং-য়ের হাতে দিতে। রুশ নানা অজুহাতে সময় কাটিয়ে অবশেষে অনুমতি দিল।

কুওমিন্তাং সেনাদল বহু অপেক্ষার পর প্রবেশাধিকার পেল। কিন্তু মুকদেন, চাংচুন, কিরিন্, সিৎসিহার আর উত্তর-কোরিয়ার সীমান্তবর্ত্তী এলাকায় প্রবেশ নিষিদ্ধ করে রাখলো রুশ-কর্ত্তৃপক্ষ।

দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুরূপ নিষিদ্ধ করে রেখেছে আমেরিকা—সেখানে অন্য কোন দেশের ফৌজকে প্রবেশ করতে বাধা দেওয়া হয়েছে।

চিয়াং কাই শেক খুশি, মাঞ্চুরিয়া দখল হয়েছে। কিন্তু এতটা কাল বৃথাই নষ্ট করে নাই কমিউনিষ্ট দল। তারা জহোল, চাহার, শেন্‌সি, শান্‌সি প্রদেশে রীতিমত কমিউন্ বসিয়ে তাদের প্রভাব বিস্তার করে ফেলেছে। চতুর প্রচার-কার্য্যে বলতে গেলে সমগ্র মাঞ্চুরিয়াই হয়ে পড়েছে কমিউনিষ্টদের পক্ষপাতী। সে যেন চীনের বারুদখানা, ইন্ধন পেলেই সৃষ্টি হবে অনির্ব্বাণ দাবদাহ।

তার অন্য গুরুত্বপূর্ণ কারণও ছিল। প্রথমতঃ দেশদ্রোহী আর জাপানের তাঁবেদার জমিদারগণ। কুওমিন্তাং সেনার আগমনে দেশবাসী আশান্বিত হয়েছিল এজন্য যে, এবার যে সব লোক দেশদ্রোহিতা করেছে, করেছে জাপানীদের সাহায্য তাদের হবে শাস্তি। কিন্তু তেমন কোন লক্ষণই দেখা গেল না। দেশের অবস্থা আগে যেমন ছিল তেমনই দাঁড়ালো, কেবল পরিবর্ত্তনের ভিতর জাপানীদের স্থান জুড়ে নিল চিয়াং সরকারের পল্টন আর অফিসার দল। এখানেই শেষ নয়, এর ওপর ফিরে এসে জমির মালিক হয়ে শাসন-শোষণ চালাতে সুরু করলো তারাই, যারা নাকি করেছে জাপানীদের সহায়তা আর করেছে দেশবাসীকে অতিষ্ঠ তাদের দেশদ্রোহিতার দাপটে।

এ সকল জমিদার পূর্ব্বে উৎপন্ন ফসলের পাঁচ ভাগের তিন ভাগ আদায় করতো মালিকানার অধিকারে, তার ওপরে নানান অছিলায় ঘুষও দাবী করতো কম নয়। কিন্তু এবারে তারা পাঁচ ভাগের চার ভাগই আদায় করতে লাগলো বিষম কড়াকড়ির সঙ্গে। তারপর তামাদি হওয়া পুরাতন খৎ নতুন করে ঝালিয়ে তুলে চক্রবৃদ্ধি হারে স্বদসহ তলব করা হলো প্রজাদের ওপর। নানা রকম জুলুমে সে টাকা আদায় করা হতে লাগলো কুওমিন্তাং সেনা-সাহায্যে।

তারপর চিয়াং কাই শেক আবার স্বরু করেছেন তাঁর জীবন-ব্রত—কমিউনিষ্ট বিনাশ। অথচ তাঁর সমর্থিত পূর্ব্ব দুর্নীতির একটিও দূর করা হলো না।

দেশবাসী প্রাণে প্রাণে বুঝ্‌লো তুতুস আর জমিদারগণ বিদেশী জাপানী অপেক্ষাও বেশি অত্যাচারী। আর এদের সহায় হলো সরকারী ফৌজ আর অফিসার, তারা যে জুলুম করে তা জাপানীরও অজানিত। অথচ পাশেই শেন্‌সি, শানসি, জহোল, চাহার প্রভৃতি প্রদেশে কমিউনিষ্ট এলাকা, সেখানে চাষীই জমির মালিক, শুধু তা-ই নয় শান্তি-শৃঙ্খলা স্থাপনকারী, দেশ রক্ষাকারী তারা নিজেরাই।

কাজেই আবার বিদ্রোহ দেখা দিল। এ বিদ্রোহের আকার গণ-বিক্ষোভ হলেও, গেরিলা বাহিনীকে কেন্দ্র করেই শক্তি সঞ্চিত হলো। স্বযোগ-স্ববিধা পেলেই জমিদার, স্বদখোর মহাজন, সরকারী সেপাই—এদের ওপর প্রতিশোধ নেওয়া হতে লাগলো রাইফেল বন্দুকের মুখে।

কুওমিন্তাং সেনারা আর ক্ষুদ্র দলভুক্ত হয়ে কোথাও থাকতে পারে না। তারা ক্রমশঃ পল্লীগ্রাম ছেড়ে শহরে এসে দল বৃদ্ধি করতে লাগলো। বিদ্রোহ দিন দিন ঘাঁটি-আশ্রয়ের যুদ্ধে পরিণত হলো। রণ দেবতা আবার চীনকে উন্মত্ত করে তুল্‌লো।

পিওপল্‌স লিবারেশন্‌ আর্ম্মি

চীনকে রক্তমোক্ষণ হতে বাঁচাতে কমিউনিষ্ট দলের মুখপাত্র হয়ে চৌ-এন্‌ লাই এলেন নানকিনে, চিয়াং কাই শেকের সঙ্গে কোন রকমে একটা সন্ধি সম্ভব কি না, তারই চেষ্টায়। অনেক তর্ক-বিচার আলাপ-আলোচনার পর কিন্তু চিয়াং কাই শেক এমন সব সর্ত্ত খাড়া করলেন যা কমিউনিষ্টদের পক্ষে গ্রহণ করা আত্মহত্যার নামান্তর। প্রথম ও প্রধান সর্ত্ত হলো—চিয়াং সরকারের হাতে

সকল কমিউনিষ্ট সেনা অর্পণ করতে হবে, আর সরকার ভিন্ন অপর কারু সেনা গঠন বা পরিচালনের অধিকার থাক্‌বে না। বলা বাহুল্য এমন সর্ত্তে সন্ধি হতে পারে না।

চৌ এন্ লাই ফিরে এলেন। মাসাবধিকাল এ আলোচনায় কেটে গেছে। কমিউনিষ্টগণ নীরবে কাজ করে যাচ্ছিল। তারা এবার মাঞ্চুরিয়ার গেরিলা বাহিনী ও বিক্ষুব্ধ শ্রমিক শ্রেণীকে আপন কুক্ষিগত করে জনগণের মুক্তি-ফৌজ (People's Liberation Army) গঠন করে ফেল্‌লো। তারা সকল জাতীয়তাবাদী দলের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল পূর্ব্বেই বলেছি।

চৌ এন্ লাই আবার নানকিন্ হতে খবর এনেছেন যে সুং পরিবার আমেরিকার কোন ব্যাঙ্কে দু'হাজার দু'শ' কোটি ডলার (আমেরিকান্) গচ্ছিত রেখেছে বিদ্রোহ ও গণ-বিক্ষোভের ভয়ে। এরূপ অপরিমিত অর্থ আজ চীনের স্বার্থে ব্যয় না হয়ে দেশের বাইরে চলে গেল, গণমনে ক্ষোভ বেড়ে উঠ্‌লো। যুদ্ধ চললো পূর্ণ উদ্যমে।

চিয়াং কাই শেক স্থির কর্‌লেন কমিউনিষ্টদের মূল ঘাঁটি ইনেন সোভিয়েটকে পদানত কর্‌তে পার্‌লেই দস্যুগুলার জারিজুরি ভাঙ্গবে। তিনি প্রবল শক্তি নিয়োগ কর্‌লেন এ কাজে। ইনেনের পতন হলো। কিন্তু ইনেনের পতন আমন্ত্রিত করলো চিয়াং-য়ের পরাজয়কে।

আসল কথা হলো কমিউনিষ্ট এলাকার সঠিক কোন সংবাদ চিয়াং সরকার সংগ্রহ কর্‌তে পারে নাই। কারণ গুপ্তচর গোয়েন্দা প্রভৃতি সে এলাকায় গেলে আর ফিরে আসে না, সংবাদ দেবে কে? কাজেই কমিউনিষ্টদের শক্তি সম্বন্ধেও সরকারের নির্ভরযোগ্য কোন ধারণা ছিল না।

ইনেন-এর পতনের পর দেখা গেল উত্তর মাঞ্চুরিয়ার বড় বড় কয়েকটা শহর ছাড়া বাকি অংশ কমিউনিষ্টদের দখলে। হারবিন্ আর সিংসিহার তাদের দুর্দ্ধর্ষ ঘাঁটি। সরকারী ফৌজ মাঞ্চুরিয়ায় সাধারণ লোকের নিকটও অবাঞ্ছিত ও বিরোধিত। আবার হাইনান দ্বীপে, দক্ষিণ চীনেও বড় বড় গোপন ঘাঁটি দেখে চিয়াং-এর বিস্ময়ের অবধি রইলো না।

এ সময়ে আমেরিকার প্রগতিশীল দলের অনেকে কমিউনিষ্ট এলাকায় ভ্রমণ করে এদের সুব্যবস্থায় চমৎকৃত হন। আমেরিকার সাহায্যে কমিউনিষ্টদের নিষ্পেষণ চলছে বলে দুঃখ প্রকাশ করেন। কিন্তু জনগণের মুক্তি ফৌজ দেখে আশান্বিত হন।

জনগণের মুক্তি ফৌজ গঠিত তিন শ্রেণীর অস্ত্রধারী দিয়ে। জনগণের মিলিশিয়া বা মিনপিং দল, গেরিলা দল ও স্থায়ী (রেগুলার) সেনাদল। মিন্‌পিং দল কৃষকদের দিয়ে তৈরি, বেসামরিক নেতৃত্বে প্রতি গ্রাম তাদের কর্ম্মভূমি। বিশেষভাবে ডাকাতের আক্রমণ হতে গ্রাম রক্ষা তাদের প্রধান কর্ত্তব্য। সমগ্র একটা জেলা জুড়ে সামরিক নেতার অধীনে গেরিলা দলের অভিযান। রেগুলার সেনাদল সমগ্র উদ্ধার-করা মুক্ত এলাকায় যে কোন স্থানে প্রেরিতব্য। বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে এবং এ তিন দলেব ফৌজে অদ্ভুত যোগাযোগ। সকল দলেই কিছু কিছু শিক্ষিত তরুণ-তরুণী রয়েছে।

১৯৪১ খৃঃ অঃ ঘরে তৈরি শট্-গান্ নিয়ে প্রথম পত্তন হয় গ্রাম্য মিলিশিয়ার। ডাকাতদের সঙ্গে লড়ে তাদের খতম করে হতো তখন অস্ত্র সংগ্রহ। এ সময়ে অষ্টম রুট সেনাদল উত্তব অঞ্চলে থেকে স্বেচ্ছাসেবকদের ট্রেনিং সুরু করে। গ্রাম্য চাষীরা সে শিক্ষালাভ কবে আসে। একদল পায় বোমা তৈরি করা ও স্থল-মাইন, বোমা প্রভৃতিব ব্যবহাব সম্বন্ধে শিক্ষা। তাবাই গ্রামে গ্রামে ঘুরে শিক্ষাদান করে। অষ্টম রুট সেনা কিছু হাত-বোমা এদের দেয়। তার সাহায্যে প্রতিপক্ষকে নিধন কবে এরা করে রাইফেল কার্ত্তুজ সংগ্রহ।

এমনি কবে সমগ্র উত্তর চীনের পার্ব্বত্য অঞ্চল ছেয়ে যায় মুক্তি ফৌজে। ক্রমশঃ এদের দল পুষ্ট হতে থাকে। ১৯৪২ খৃঃ অঃ কাউন্টি এসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠা করা হয়। কৃষকেরা প্রত্যেকে কতক জমির ফসল নির্দ্দিষ্ট করে দেয় এসোসিয়েশনের হাতে অস্ত্র-শস্ত্র কিনবাব জন্য। শস্ত্র বিক্রি কর্‌লো কারা?

এ সময়ে এদেব যুঝ্‌তে হয়েছে চার-চারটি বিভিন্ন আততায়ীর সঙ্গে। প্রথমতঃ জাপ-সৈন্য। আট-দশ জনের ক্ষুদ্র দল দেখলেই গ্রাম্য মিলিশিয়া হাত বোমা নিয়ে চড়াও হতো, বা চলাব পথে মাইন পেতে লুকিয়ে থাক্‌তো। মাইন ফেটে বা হাত বোমার আঘাতে জাপ সেনা নিপাত হলে তাদের অস্ত্র নিয়ে আস্‌তো ওরা।

দ্বিতীয় দুষমন কুওমিন্তাং সেনা। তৃতীয় শত্রু তুতুস সেনাপতিদের বাহিনী, জাপানেব অর্থ-পুষ্ট, জাপানী আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত। এ দু'দলের কাছ থেকেই চল্‌তো অস্ত্র কেনা। এখন এ সকলের ঘাঁটি শহরে। গ্রাম হতে খাদ্য-সংগ্রহ না কর্‌লে শহরের চলে না। যখনই খাদ্যাভাবে এরা গ্রাম থেকে সে সব কিন্‌তে আস্‌তো, তখনই মূল্য অর্থে গ্রহণ না করে অস্ত্র-শস্ত্র দিয়ে পরিশোধ

করতে বলা হ'তো। তারা সানন্দে সে ব্যবস্থায় রাজি হতো। অনেকে আহার্য্যের প্রাচুর্য্য দেখে গ্রাম্য মিলিশিয়ায় যোগদান করতো আপন দল ত্যাগ করে। এদের কাছ থেকে মূল্যবান সংবাদও মিল্‌তো যার বলে শত্রুপক্ষকে অতি সহজে কাবু করা সম্ভব হতো।

চতুর্থ দল হল ডাকাতগণ। তারাও অতি-আধুনিক রাইফেল পিস্তল ব্যবহার কর্‌তো। তাদেরে মেরে-কেটে অস্ত্র সংগ্রহের কৌশল আগেই বলা হয়েছে।

মিলিশিয়া ও গেরিলা আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে এমন প্রবল বাধা দান করে যে, শত্রুপক্ষ মনে করতো এরাই অষ্টম রুট সেনা, ভয়ে তারা আর শহরের বাহির হতো না।

১৯২৭ খৃঃ অব্দে চু-তে মাও সে তুন্ দক্ষিণ হুনানে যখন প্রথম মুক্তি ফৌজ গঠন করেন, তখন থেকে আজ অবধি এ ফৌজের নাম বহুবার পরিবর্ত্তন করা হয়েছে। ১৯২৭-এ ছিল মাত্র তিন হাজার সৈনিক। এ পল্টন যখন 'চাইনিজ রেড্ আর্ম্মি' নাম ধারণ করলো তখন সৈনিকের সংখ্যা তিন লক্ষ (কিয়াংসি অঞ্চলে)। কিন্তু বিখ্যাত লং মার্চ্চ ('মরণ-বিজয়ী চীন' দেখুন) শেষ হলে মাত্র চল্লিশ হাজার অবশিষ্ট রইলো।

জাপান-যুদ্ধের সময় জেনারেলিসিমো চিয়াং কাই শেক অধিকার দিলেন চু-তে'কে পঁয়তাল্লিশ হাজার কমিউনিষ্ট সেনা গঠন পরিচালনের। এ সেনাদলের নাম হলো অষ্টম রুট আর্ম্মি। লড়ায়ের তীব্রতা বাড়্‌লে আবার ইয়াংসি উপত্যকায় নতুন একদল কমিউনিষ্ট ফৌজ নিয়োগের অনুমতি এল। এ দলের নাম দেওয়া হলো নিউ ফোর্থ। এ দু'দলে সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে এগার লক্ষে দাঁড়ালো। এর ওপর মাঞ্চুরিয়ার সেনাদল যা তখনো শিক্ষানবীশ মাত্র।

১৯৪৬ খৃঃ অব্দের শেষভাগে কমিউনিষ্টদের সকল সেনাদল একত্রিত করে নাম দেওয়া হলো পিওপল্‌স্ লিবারেশন আর্ম্মি। পনর লক্ষ রেগুলার্‌স্ আর তারও বেশি সংখ্যায় গ্রাম্য মিলিশিয়া দল। কমিউনিষ্টদের লোকবল সব সময়েই ছিল অস্ত্র-শস্ত্রের অনুপাতে বেশি। বিশেষ করে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরে যুদ্ধে-বন্দী সৈনিকেরা মুক্তি পেয়ে এ সেনাদল ভুক্ত হয়, তাদের সংখ্যাই হলো লক্ষ লক্ষ। এমন কি বন্দী শত্রু-সেনাও যোগদান করে এদের দলে।

চিয়াং কাই শেক উত্তর অঞ্চলেই কমিউনিষ্টদের যুদ্ধরত করেন জাপদের সঙ্গে, যেখানে তাঁর নিজের সৈন্য আগেই ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে জাপদের হাতে। তাঁর উদ্দেশ্য

ছিল জাপদের আক্রমণে ওরা নিশ্চিহ্ন হোক। কিন্তু ওরা বিনষ্ট হলো না। তাই ১৯৪০ খৃঃ অঃ অষ্টম রুট আর্ম্মি ও নিউ ফোর্থ আর্ম্মি যে স্থানে যুদ্ধ-রত তার চারদিক চিয়াং রাখলেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কুওমিন্তাং সেনা দিয়ে ঘেরাও করে।

তাতেও তুষ্ট না হয়ে ১৯৪১ এর জানুয়ারী মাসে নিউ ফোর্থ আর্ম্মির হেড কোয়ার্টার ও পশ্চাৎ দিকের রক্ষীদের আক্রমণ করলেন চিয়াং। অজুহাত সৃষ্টি করা হলো যে জেনারেল ইয়ে তিং সাগরতীর (চিকিয়াং হতে শানতুং) দখল করতে ষড়যন্ত্র করছেন। বহু সেনা ধ্বংস হলো। তারপর চিয়াং এ-সেনাদলকে ইয়াংসি উপত্যকা ত্যাগ করতে আদেশ দিলেন। প্রতিবাদ জানিয়ে নিউ ফোর্থ সেনা কিছুটা আদেশ পালন করতে লাগলো। মূল সেনা উত্তরে সরে গেলে চিয়াংএর আশি হাজার ফৌজ অবশিষ্ট ফোর্থ আর্ম্মিকে ঘেরাও করে হত্যা করলো। তাতে চার হাজার অস্ত্রধারী, ছয় হাজার অস্ত্রহীন লোক, অফিসারদের পরিবার, রাজনৈতিক কর্ম্মী ও হাসপাতাল ছিল।

এর পর চুংকিন্ সামরিক কাউনসিল ফোর্থ আর্ম্মিকে অবৈধ ঘোষণা করে ভেঙ্গে দিতে আদেশ দিল। কিন্তু কমিউনিষ্ট সামরিক কমিটি এদের স্বরূপ চিনে নিয়ে এ আদেশের পাল্টা আদেশ জারি করলো যে চেন্ ইয়াই চালিত নিউ ফোর্থ আর্ম্মি সম্পূর্ণ বৈধ। জাপদের ও জাপ-তাঁবেদার দেশদ্রোহীদের ধ্বংসে এদের নিয়োগ করা হলো। এই প্রথম প্রকাশ্যে মতদ্বৈধ।

এর পরে ১৯৪৩এ সমগ্র কমিউনিষ্ট পার্টি ভঙ্গ করে দিতে চিয়াং আদেশ দিলেন। ১৯৪৪এ আদেশ দেওয়া হলো সৈন্য-সংখ্যা দশম ভাগে পরিণত করতে, কিন্তু কমিউনিষ্টরা তা গ্রাহ্য করে নাই। আদেশ অগ্রাহ্য করেছিল বলে কমিউনিষ্ট পার্টি জাপানীদের অধিকৃত আমুর হতে কোয়েচাউ পর্য্যন্ত সাড়ে চার লক্ষ বর্গ মাইল স্থানের তিন লক্ষ বর্গ মাইল মুক্ত করতে সক্ষম হয়।

আগেই বলেছি জাপরা উত্তর চীনে আত্মসমর্পণ করে নাই, যুদ্ধ চালিয়েছে। ১৯৪৫এর আগষ্ট মাস মধ্যে কমিউনিষ্টরা পঁচাশিটি শহর, পাঁচটি শানতুং বন্দর ও একটি প্রাদেশিক রাজধানী দখল করে। সেপ্টেম্বর মাস মধ্যে কালগান হতে ইয়াংসি-নদ মুখ এবং শেন্সি হতে শানতুং দিয়ে সাগরতীর পর্য্যন্ত কমিউনিষ্ট এলাকা হয়ে যায়। সর্ব্ববৃহৎ শহর ক'টা ও রেলওয়ে ঘাঁটি বাদে। ইনেনের পতন হয়েছিল তাও পুনরুদ্ধার হলো (১৯৪৪)।

ফলে চিয়াং-এর ক্ষমতা খর্ব্ব হলো, সে হয়ে রইলো একজন তুতুসের সামিল। কিন্তু কমিউনিষ্টগণ কম্যাণ্ডার ইন্ চীফ চু তে, কম্যাণ্ডার (ফোর্থ আর্ম্মি) লাই সিয়েন নিয়েন ও ডেপুটি কম্যাণ্ডার ওয়াং চেন্ এর পরিচালনায় দুর্দ্ধর্ষ হয়ে উঠ্লো।

সে সময় এল মার্শাল প্ল্যান্। সমগ্র যুদ্ধে যে ক্ষতি কমিউনিষ্টদের হয়েছে, তার চেয়ে ঢের বেশি ক্ষতি হলো মার্শাল প্ল্যানের শান্তির নামে কমিউনিষ্ট নিগ্রহে। উপরন্তু মার্শাল প্ল্যান চিয়াংকে দিল পূর্ব্বের আড়াই গুণ চমৎকার অস্ত্রসজ্জিত সেনা, নৌবহর, উড়োজাহাজ, কুড়ি কোটি ডলার মূল্যের সমর সম্ভার আরো কত কি। ফলে পাঁচটি কমিউনিষ্ট আড্ডা (কালগান, চাংতে প্রভৃতি) অধিকার করা চিয়াংএর পক্ষে সম্ভব হলো। পরে অবশ্য আবার হাতবদল হয়েছে।

নিউ ডেমোক্রেসি

কিন্তু এবার কমিউনিষ্টদের নতুন কর্ম্মপন্থা। সৈন্য সংখ্যা হলো দ্বিগুণ। তাদের দুটি প্রধান নীতিই এর মূলে। প্রথম—সৈনিক দেশ ও দেশবাসীর সেবক, জনগণেব হুকুমদার নয়। দ্বিতীয়—সৈনিক অফিসারদের পরিচারক নয়, বন্ধু। পদাঘাত ও গালিগালাজ দিয়ে তাদের চালানো হয় না। আলোচনা ও উপদেশ দিয়ে ত্রুটি সংশোধন করা হয়, অফিসারের ত্রুটিও সৈনিকরা অনুরূপ ভাবে জানায়। এ ভ্রাতৃভাবই যাতে এদের অজেয় করে তার তত্ত্বাবধান করছেন চু-তে আর জেনারেল লিয়াং চুন।

১৯৪৩-৪৪এ হোপেই অঞ্চলের অজন্মার সময় সৈন্যরা দশ হাজার কূপ খনন করেছে, সাতাশ মাইল লম্বা বাঁধ তৈরি করে বন্যা প্রতিরোধ করেছে। প্রত্যেক সৈন্য নিজের জন্য এক একরের ছয় ভাগের পাঁচভাগ ও দুর্গতদের সাহায্যের জন্য এক একরের এক-তৃতীয়াংশ জমি চাষ করেছে। অথচ সঙ্গে সঙ্গে চলেছে জাপানীদের প্রতিরোধ। অনেক সময় সৈন্যরা নিজেদের রেশন কমিয়ে অনাহার-ক্লিষ্টদের আহারের ব্যবস্থা করেছে। ভোট নিয়ে সর্ব্বসম্মতিক্রমে এ সিদ্ধান্ত করা হয়েছে গ্রহণ।

এ সকল ব্যবস্থা, মার্শাল প্ল্যানকে অস্বীকার—সবই হলো নতুন কর্ম্মপন্থা, নিউ ডেমোক্রেসি ও নিউ ক্যাপিটালিজমের ফল। (মুখবন্ধ অধ্যায় দেখুন)। প্রগতিশীল ধনিক ও ত্যাগব্রতী জমিদারদের দলে টানবার উদ্দেশ্য তো প্রধানই। মাও সে তুনের সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতা থেকে পরিষ্কার বুঝা যায় কমিউনিষ্টদের

বিরোধ দেশীয় ও বিদেশীয় প্রতিক্রিয়াশীলদের সঙ্গে, কাজেই শ্রেণী-সংঘাত লক্ষ্য নয় চীনে।

পিওপলস্ লিবারেশন আর্ম্মি প্রমাণ করেছে যে সমগ্র চীনজাতিই কমিউনিষ্ট ভাবাপন্ন—নিউ ডেমোক্রেসির প্রত্যক্ষ ফল। কেন না মাওয়ের কূটনীতি ইউরোপীয় মার্ক্সবাদকে করেছে এশিয়াটিক মার্ক্সবাদ—সকল প্রগতিশীল দলকে এক পতাকাতলে আনয়ন করে, শ্রেণী-সঙ্ঘাত অপ্রবর্ত্তিত রেখে।

কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা পরিবর্ত্তন হলো নিউ ডেমোক্রেসিতে—নেতৃত্ব শ্রমিকের হাতে। মাও সে·তুন, চু তে সম্বন্ধে আগে বলা হয়েছে। কম্যাণ্ডার লাই সিয়েন নিয়েন ছিলেন ছুঁতোর হ্যাঙ্কো শহরে। ওয়াং চেন ছিলেন এক ব্রিটিশ ইঞ্জিনিয়ারের ছোকরা চাকর। ইঞ্জিনিয়ার পত্নীর প্রহারে গালিবর্ষণে সেখান থেকে পালিয়ে আসেন। এখন তিনি শ্বেত-বিরোধী পুরোমাত্রায়। তা হলেও নিউ ডেমোক্রেসি আজ প্রবর্ত্তনের সুযোগ মাও পেতেন না, যদি না সকল সময়েই (চালিন, কালগান, ইনেন প্রভৃতি) তিনি প্রলম্বিত সমরের (Protracted war) সুযোগ গ্রহণ করে সার্থক স্থানান্তর-করণে (successful retreat) সক্ষম হতেন। এ নীতিই অস্ত্রহীনের পক্ষে সুসজ্জিত সেনা প্রতিরোধের পথে শ্রেষ্ঠতম কৌশল, বিশ্ব-সমর-ধুরন্ধরগণ একবাক্যে স্বীকার করেন।

বড়-দি চেন্

নারী কর্ম্মীও কম নাই এদের ভিতর। গেরিলাদের পোষাক তৈরি করা, নার্সের কাজ করা আর দলের হয়ে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা এদের প্রধান কাজ। তারপর জরুরি প্রয়োজনে অনেক কিছুই এদের করতে হয়। রেগুলার সেনাদলের কোন কাজ করা এরা সম্মানজনক মনে করে। তাই এক সময় এদের তৈরি করতে হয়েছিল জুতার তলি, চামড়ার অভাবে শণের দড়ি দিয়ে, তাও আবার একটি দুটি নয়—সমগ্র রেজিমেণ্টের জন্য। শণের দড়ি বুনট করে প্রায় এক ইঞ্চি পুরু করে তৈরি হলো জুতার সোল। সে কার্য্যের লিডার ছিলেন বড়-দি চেন্ (Big Sister Chen)। তিনি আবার গণ-সঙ্গীত (Yang-ke) গেয়ে কর্ম্মী-নারীদের কর্ম্মতৎপরতা বৃদ্ধি করতেন, কখনো করতেন নৃত্য।

বড়-দি চেন্ অতি গম্ভীর, কিন্তু সময়ে বালিকার মত কৌতুকময়ী। গেরিলাদের সাহায্য করতে নারী-বাহিনীকে শিক্ষাদান তাঁর কাজ। আবার দরকার

হলে গোপনে সন্ধান করে গেরিলাদের নেত্রী হয়ে যুদ্ধ করতেও তিনি পেছপা নন।

একটি গেরিলা কম্যাণ্ডারের মা, মাদাম চাও, পুত্রের দলের সঙ্গে থেকে রীতিমত রাইফেল চালনা করতেন। আর একটি নারী (চাইনিজ মাদার) তেষট্টি বছর বয়সেও খর্ব্ব-পদ নিয়ে গেরিলাদের সঙ্গে করতো শফর, তাদের পোষাক কেচে দিত। যখন আর হাঁটতে পারতো না, তখন যে কোন গ্রামে ধোপার কাজ করতো আর গোপনে চিয়াং-বিরোধী প্রাচীর-পত্র সেঁটে দিত রাজপথে।

১৯৪৬-এ চিয়াং সেনা উত্তর কিয়াংসু আক্রমণ করলে দুই হাজার নারী গণ-মিলিশিয়ায় যোগদান করে। কাও ফ্যাং ইয়েইং শ্রমিক পত্নী হয়েও এদের একটি ছোট দলের চালিকা।

সিনটাও নৌ-ঘাঁটির নিকটে, কিয়াও তুং-এ আছে পাঁচটি বীরাঙ্গনা পঞ্চব্যাঘ্র নামে। দুটির বয়স উনিশের বেশি নয়—সান্ ইউ মিন্ একদিনে আঠারোটি শত্রুসেনাকে গুলী করে মারে। জেসমিন্ মেরেছিল দুটি মাইন্-স্থাপক শত্রুকে। তা ছাড়া তার কাজ ছিল এ অঞ্চল থেকে যারা চিয়াং-সেনাদলে যোগ দিয়েছে, তাদের পরিবারের নারীদের হয়ে ওই সেনাদের কাছে চিঠি লেখা। সে চিঠির ফলে অনেক চিয়াং ফৌজ অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে এসে কমিউনিষ্ট দলে যোগ দেয়।

মার্শাল প্ল্যানের প্রত্যুত্তর

কমিউনিষ্টদের কেন্দ্রীয় উপত্যকা এলাকা হারাবার পর মার্শাল প্ল্যানের প্রকৃত অর্থ বুঝে দেশে বিপ্লব-বিদ্রোহ দেখা দিল, সে কথা বলা হয়েছে। এটা বিশ্ববিখ্যাত এজন্য যে চল্লিশ লক্ষ রেগুলার সেনা ও স্থানীয় মিলিশিয়া লক্ষ লক্ষ যোগ দিল এ বিদ্রোহে। যুদ্ধ বিস্তার লাভ করলো, ১৯৪৮এর ডিসেম্বর মধ্যে সুচাও অধিকার করে মুক্তি ফৌজ ইয়াংসি নদের উত্তরের সমগ্র অঞ্চল উদ্ধার করলো। কারণ সুচাও ছিল সে অঞ্চলে সর্ব্বপ্রধান ও শেষ কুওমিন্তাং আশ্রয়-স্থান।

সঙ্গে সঙ্গে চল্‌লো সংগঠন। তার প্রকৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গির আভাষ নিম্নে দেওয়া হলো।

বিদেশী-বর্জ্জন

চীনদেশের সর্ব্বত্র বিনা পাসপোর্টে অবাধ যাতায়াত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আবার। কিন্তু কোনো বিদেশীকে সে সুবিধা দেওয়া হয় না। দোকানগুলার সাইনবোর্ড,

হোটেল রেস্তোরাঁর নাম ইংরেজীর বদলে চীনা হরফে লেখা হয়েছে। মাল মোড়ক, প্যাকেট, ফাইল—সব কিছুর ওপর চীনা ভাষা।

ইঙ্গো-আমেরিকা চীনে আপন স্বার্থরক্ষায় করেছিল ষড়যন্ত্র, করেছিল স্বাধীনতা অর্জ্জনের পথে গোপন অন্তর্বিপ্লবের সৃষ্টি। চীনের জনসাধারণ তাই কেরোসিন তেল বর্জ্জন করেছে। ওটার নাম দিয়েছে বিলাতী তেল। তার বদলে কাজ চালায় রেড়ির তেল, তিসি তেল দিয়ে। আমেরিকান ফিল্‌ম প্রদর্শনও নিষিদ্ধ হয়েছে।

শ্রেণীভেদ বিলোপ

কমিউনিষ্ট শাসন প্রবর্ত্তনে দুর্দ্দশামুক্ত চীনবাসী শ্রেণীভেদ বিলোপের দাবী করে। প্রবল উত্তেজনার ঝটিকায় রেলগাড়িগুলার উচ্চ শ্রেণীর গদি ফেলে সব একাকার গণ-শ্রেণীতে রূপায়িত করা হয়েছে।

সাংহাই ও অন্যান্য কমিউনিষ্ট এলাকায় জাগ্রত জনমতের পোষকতায় শ্রমিকেরা কল-কারখানা অধিকার করে নিজেদের মালিক বলে প্রচার করেছে। মাও গবর্ণমেণ্ট তাদের করেছেন সহায়তা, করেছেন নিয়ন্ত্রণ।

ইন্‌ফ্লেশন্‌ নিবারণ

মাও গবর্ণমেণ্ট অন্ন-সরবরাহ ও ফাঁপতি-বাজার-দমনে সকল শক্তি নিয়োগ করেছেন। একটি কেন্দ্রীয় মিউনিসিপ্যাল ট্রেডিং কোম্পানী ও তার শাখা প্রতিষ্ঠা করে সরকারী কণ্ট্রোল দরে খাদ্য, নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য বিক্রি করা হচ্ছে। এ কণ্ট্রোল দর বাজার মূল্য অপেক্ষা কম। পঞ্চাশটি শাখা হয়েছে, আরো খুলবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ফলে এখন ফুটপাথে সস্তায় পণ্য বিক্রয় সুরু হয়েছে। বিদেশী দোকান-পাটের মাথায় বাজ পড়েছে। তারাও এজেণ্ট মারফত ফুটপাথে রেখে মাল বিক্রির ব্যবস্থা করতে বাধ্য হয়েছে। বিদেশী দোকানে কেউ ঢুকতে চায় না।

চীনে বাজার দর এত বেশি ফেঁপে উঠেছে যে টাকার কোন দাম নাই। নতুন ব্যবস্থা হয়েছে, সরকারী কর্ম্মচারী, শ্রমিক, শিক্ষক-অধ্যাপক—সকলের বেতন মুদ্রায় না দিয়ে দেওয়া হচ্ছে খাদ্যদ্রব্যে। বেতন যোগ্যতানুসারেই রয়েছে। চাহিদা মত খাদ্যদ্রব্যের অতিরিক্ত যে প্রাপ্য তা দ্রব্যের বদলে গণ-নোটেও

করা যেতে পারে শোধ। গণ-নোট দিয়ে জুতা, কাপড়, ময়দা মিলে। পিওপল্‌স ব্যাঙ্ক খোলা হয়েছে, সেখানে নোট জমা দিয়ে দরকার মত জুতা, কাপড়, ময়দা পাওয়া যেতে পারে। গণ-নোট পণ্য পরিমাণের প্রতীক, আর পণ্যের দামও লেনদেন তারিখের বাজার দর হারে কর্ত্তিত হয়। কাজেই নোটের মূল্য পরিবর্ত্তনশীল বলে সঞ্চিত রাখার স্থবিধা হয় না, ফাটকাবাজারেরও স্থযোগ থাকে না।

সমগ্র মাঞ্চুরিয়ায় হয়েছিল মুদ্রা-প্রচলনের বিষম বিপর্য্যয়। এক বৎসরে সেদেশে পর পর চারিটি প্রকার মুদ্রা প্রচলনের ব্যর্থ প্রয়াস চলে বিভিন্ন গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক। জাপানের পতনের সঙ্গে সঙ্গে 'ইয়েন' মুদ্রা অচল ও অদৃশ্য হয়। তার স্থানে চালু হয় রেড আর্ম্মি মুদ্রা, চিয়াংএর সম্মতি নিয়ে মুদ্রিত। কিন্তু ক'মাস পরেই চিয়াং তা বন্ধ করে দেন, তার স্থলে কেন্দ্রীয় সরকারের মাঞ্চু-মুদ্রা বহাল হয়। সে মুদ্রাও তিন মাস পরে অচল হয়ে যায়।

এর পরে আসে গণতান্ত্রিক নোট। লোকে এটাকে খুব সমাদরে গ্রহণ করে, কারণ সরকারী ট্যাক্স, রেলওয়ে টিকেট ও পার্শেল ভাড়া, আর বাজেয়াপ্ত জাপানী মাল ক্রয়ই চলতো এ নোট দিয়ে।

এই ক্রমাগত মুদ্রা পরিবর্ত্তনে বহু লোক সর্ব্বস্বান্ত হয়েছে, ধনী ফকির হয়েছে। কাজেই মাঞ্চু-বাসী মুদ্রা ত্যাগ ক'রে, চাল-গম প্রভৃতি দানাকেই মুদ্রার আসন দান করেছিল। এটা সব সময়েই কৃষকদের ভিতর প্রচলিত ছিল; এখন শহর-শ্রমিক, শহর-বাসীও সে রীতি গ্রহণ করেছে।

ঋণদান

যুদ্ধকালীন ফসল নাশ, কয়েক বৎসরের অজন্মা, চীনে খাদ্যাভাব উৎকট করে তুলেছে। কমিউনিষ্ট এলাকা ভিন্ন অন্যত্র তো আজও বিশৃঙ্খলা। মার্শাল প্ল্যানে যে খাদ্য-দ্রব্য আমদানি হতো, তা হয়েছে বন্ধ। উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য, বেকার সমস্যা সমাধান, বাস্তু পুনর্গঠন প্রভৃতি উদ্দেশ্যে নানকিনের পিওপল্‌স ব্যাঙ্ক টাকা ধার দিচ্ছে। কল-কারখানা চালু করবার জন্য উক্ত ব্যাঙ্ক চার কোটি ডলার ঋণদান করেছে।

বিশ্বভারতীর অধ্যাপক তান উয়ান চীন দেশ হতে ফিরে এসে বিবৃতি দিয়েছেন। তার সবচেয়ে বড়কথা হলো, নিউ ডেমোক্রেসির সৈন্যরা যে স্থান দখল করে আজ, কালই সেখানে দুর্দ্দশা তিরোহিত হয়ে শান্তি-শৃঙ্খলা বিরাজ করে।

শেষ কথা

সাম্রাজ্যবাদী শ্বেত শক্তিগণ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হবার পূর্ব্বেই, বিশেষ করে চীনের কমিউনিষ্টগণ কর্ত্তৃক শেন্‌সি প্রদেশে জাপানের গতিরোধ করবার পর থেকেই মহাচীনের মহা-সম্ভাব্যতার ভাবী সাফল্য হৃদয়ঙ্গম করে শঙ্কিত হয়ে ওঠে। তাই তারা যুদ্ধান্তে প্রশান্ত সাগরের কূলে কূলে ঘাঁটি আগ্‌লে থাকার ব্যবস্থা করলো।

জাপানে, কোরিয়ায় আমেরিকা এসে বস্‌লো। জীর্ণ ফরাসী আব ক্ষুদ্র ওলন্দাজ শক্তির দুর্ব্বলতায় প্রমাদ গুনে সমর-সম্ভার দিয়ে সাহায্য কর্‌লো ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় তাদের অধিকার অটুট রাখতে। মলয়ে সুরু করেছে ইঙ্গো-আমেরিকা পুনরধিকারের নির্ম্মম সমর। শ্যামের অশান্তি, ব্রহ্মের ইংরেজ-বিদ্বেষ তাদের বিচলিত করেছে।

আজ তারা দেখ্‌ছে কমিউনিষ্ট পার্টির সাংহাই অভিযান চীনের বহুকালের সূচিত তৃতীয় গণ-বিপ্লবকে সম্পূর্ণ করে এনেছে। আরো দেখ্‌ছে তারা আজ চীনে কমিউনিষ্ট বলে স্বতন্ত্র একটা দল নাই, সমগ্র জাতিকেই কমিউনিষ্ট আখ্যা দিতে হয়। কাজেই প্যাসিফকপ্যাক্ট দৃঢ়তর না কর্‌লে উপায় নাই।

সেজন্যই দক্ষিণ কোরিয়ায় অশান্তি দমনে প্রাণপণ চেষ্টা। শ্যামের সঙ্গে ইংরেজদের বন্ধুত্ব ঝালিয়ে তোলা। হিরোতা ও দইহারার আপীলে (১৯৪৮ নবেম্বর ৩০) জাপানের সাতটি সমর-অপরাধীর নিধন সাধন স্থগিত ও পরিত্যক্ত। সেজন্যই আমেরিকার জাপান-ত্যাগের প্রস্তাবকারী কেনেথ রয়েল চাকরি হতে বরখাস্ত। এ সমস্ত তোড়জোড়ই প্যাসিফিক প্যাক্ট দৃঢ়ীকরণ ও কমিউনিষ্ট চীনের বিরুদ্ধাচরণের পজিটিভ (প্রত্যক্ষ) প্রস্তুতি। কারণ চীনা কমিউনিষ্টদের দক্ষিণ অভিযান আজ ইঙ্গো-আমেরিকার প্রশান্ত সাগর এলাকার রক্ষা-ব্যবস্থাকে করেছে বিভীষিকা-গ্রস্ত।

আবার বেভিন্ আগে হতেই কমিউনিষ্টদের সঙ্গে দহরম্-মহরম্ করতে চেষ্টিত। লৌকিক মৈত্রীর অন্তরালে অবশ্য থাক্‌বে না-গ্রহণ না-বর্জ্জন নীতি। গরজ হলো চীনে খাটানো মূলধন বজায় রাখা আর রুশের সঙ্গে চীনের মতান্তর সৃজনের কূটনীতি পরিচালনা।

কিন্তু চীনা কমিউনিষ্টরা বিদেশী মূলধন রাখবে না বলেই মনে হয় চীন মুলুকে। ফলে আগে হোক পরে হোক বিরোধ অবশ্যম্ভাবী। কমিউনিষ্টরা যে নীতি

পাইপিং ব্রড্‌কাষ্ট-এ প্রকাশ করেছে তাতে বুঝা যায় তাদের উদ্দেশ্য অপর পক্ষকে অন্যায়ের সমর্থক প্রতিপন্ন করে তাদেরই প্রথম য়্যাগ্রেসর্-এ পরিণত হতে বাধ্য করা।

চীনের কমিউনিষ্ট অভিযান, তাই, মাত্র চীনের মুক্তি নয়, প্রকৃত প্রস্তাবে তা হলো মহাচীনের মহাপ্রাণ প্রতিষ্ঠা, যার পরিণাম সুদূরপ্রসারী। সুতরাং যুক্তির সূত্র ধরে অনুমান করা দোষের হবে না যে, চীনের ভাবী কয় মাসের ঘটনা শুধু প্যাসিফিক প্যাক্‌টকে নয়, সমর-প্যাক্টকেও প্রভাবিত ও ত্বরান্বিত করবে। ফলে দুনিয়ার শক্তি-পুঞ্জের পরস্পর সম্পর্ক-বন্ধনেও একটা তাণ্ডব উপস্থিত হতে পারে, যা পরিশেষে পৃথিবী-ব্যাপী বিপ্লবের সর্ব্বশেষ পর্য্যায়েও পর্য্যাবসান লাভ করতে পারে। ইহা অসম্ভব নয়।

এ ব্যাপারে দু বছর আগে ইউ-এন্‌-ও'তে বার্নার্ড বারুচ যে নির্ম্মম উক্তি করেছিল আণবিক একচেটিয়াত্বের সমর্থনে, সে কথা মনে রাখলে কে য়্যাগ্রেসর হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না।

বারুচ বলেছিল—Peace seems beautiful during the savagery of war, but it becomes almost hateful when war is over.

(শান্তি মনোহর মনে হয় সমরের বর্ব্বরতার কালেই, যেই সমর হয় সমাপ্ত শান্তি তখন ঘৃণার্হ)

সত্য কথা বল্‌তে কি আজকেকার যারা বিশ্ব-পণ্য-পরিবেশক, তারা জার্ম্মানী ও জাপানের পরাভবকে জুলুমের, ফ্যাসিবাদের ওপর ঐতিহাসিক বিজয় মনে করে না, মনে করে সারা বিশ্বে তাদের বাণিজ্য-প্রতিদ্বন্দ্বীর পতন যাতে তাদের বাণিজ্য-পথ হয়েছে বাধাহীন।

তবু মাও সে তুন্‌ সাম্প্রতিক বেতার বক্তৃতায় বলেছেন, সারা বিশ্বের প্রগতিশীল দলের সহায়তা না পেলে জয়লাভ সম্ভব নয়। জয়লাভের পরও স্থায়ী শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনেও প্রগতিসম্পন্ন দলের সমর্থন নিতান্ত প্রয়োজন। অনাগত ভবিষ্যই রহস্যাবৃত রেখেছে সে পরিণামকে।